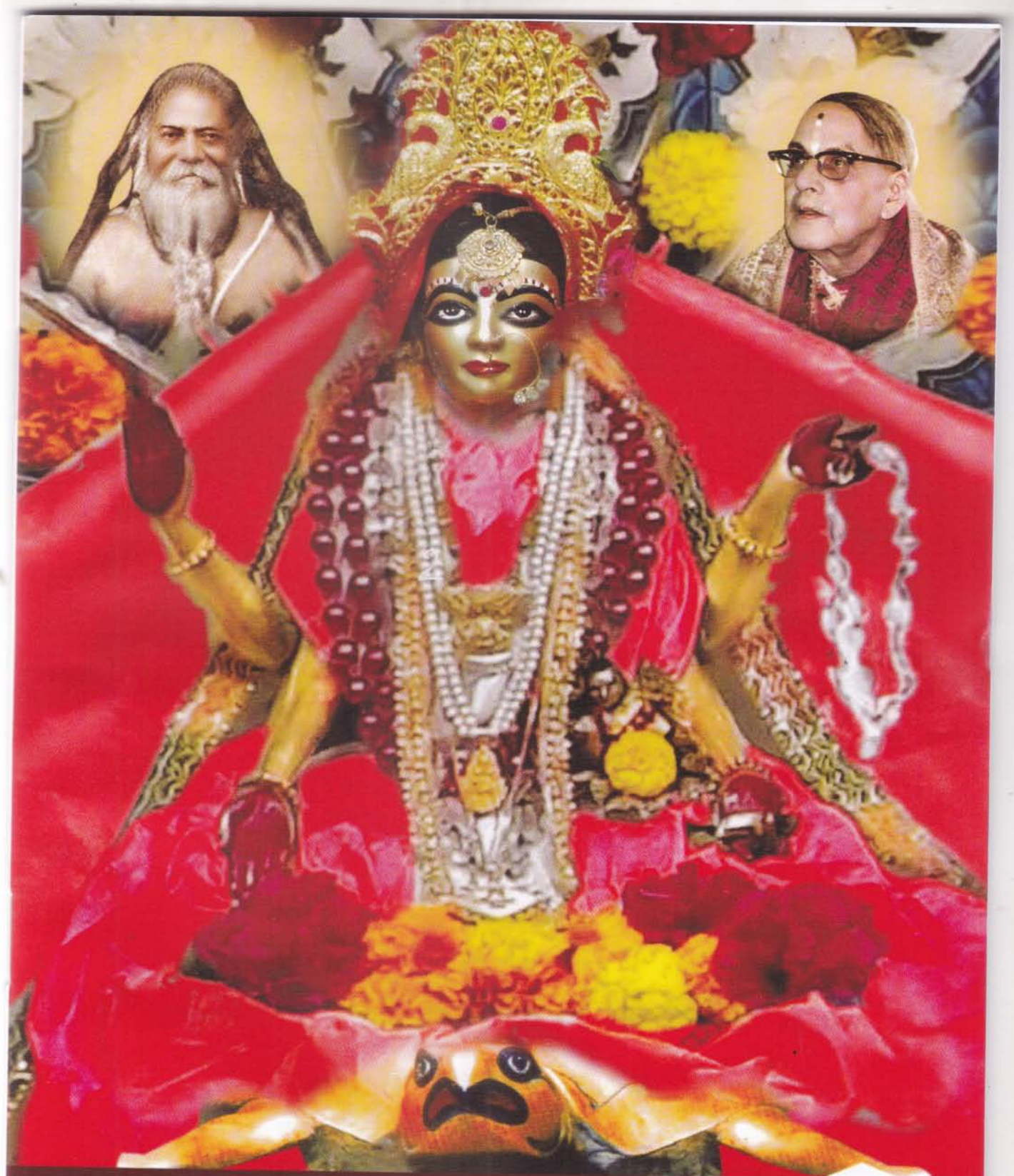

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

শুভ
গুরুপূর্ণিমা তিথি
২০২৫

শ্রীশ্রীগুরবে নমঃ

"জাগরণে যারে দেখিতে না পাই
থাকি স্বপনের আশে,
ঘুমের আড়ালে যদি দেখা দেয়,
বাঁধিব স্বপন পাশে।
এত ভালবাসি, এত যারে চাই,
সদা মনে হয় সে যে কাছে নাই;
যেন এ আমার আকুল আবেগ,
তাহারে আনিবে ডাকি,
দিবস রজনী আমি যেন কার আসার আশায় থাকি।"

পিতৃদেব ৺রমেন ভট্টাচার্য্য ও মাতৃদেবী ঁসুমিত্রা ভট্টাচার্য্যকে স্মরণে রেখে

শ্রীশ্রীগুরুচরণাশ্রিত—
নীলাঞ্জন, সোহিনী, অঙ্কিত ও আরভ্
মুম্বাই

শ্রীশ্রীবালেশ্বরী পত্রিকা

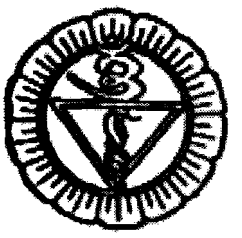

৬৪ তম বর্ষ ● শুভ গুরুপূর্ণিমা ১৪৩২ সন ● দ্বিতীয় সংখ্যা

সেক্রেটারী: শ্রী সুরজিৎ দে

সম্পাদিকা: শ্রীমতী কনিকা পাল

শ্রীশ্রীমোহনানন্দ সমাজ সেবা সমিতি কর্ত্তৃক প্রকাশিত

এ.ই. ৪৬৭ সল্টলেক সিটি, কলকাতা-৭০০ ০৬৪

ফোন: ২৩২১-৫০৭৭/৫১২৩, মোবাইল: ৮০১৭২২৭০৯৯

E-mail: sreesreemohananandatrust@gmail.com / mohananandasamaj@gmail.com

মুদ্রণ: জয়শ্রী প্রেস, ৯১/১বি বৈঠকখানা রোড, কলকাতা ৭০০০০৯। ফোন: ৯৮৩০১৮৮৭২৪

সূচীপত্র

সতাং প্রসঙ্গ		৩০
গীতার মর্ম (পরবর্তীঅংশ)	শ্রীদেবপ্রসাদ রায়	৩২
স্মৃতির আলোকে বিগতদিন (পূর্বপ্রকাশিতের পরবর্তী অংশ)	শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র	৩৫
অভিশপ্ত অশ্বত্থামা	শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়	৩৯
অবনীমোহনিয়া মোহনানন্দজী (পূর্বপ্রকাশিতের পর)	শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর	৪০
শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরী (ভক্তের অনুভূতিতে-প্রথম পর্ব)	শ্রীসোমনাথ সরকার	৪৩
জপ-ধ্যান	শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক	৪৬
পুণ্য-পরশ-পুলক (১৯শ পর্ব)	শ্রীবসুমিত্র মজুমদার	৪৮
আমি কে?	শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়	৫০
MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 17/02/2025 to 20/05/2025)		৫৩
'সত্যের তুমি মূর্ত প্রতীক'	শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল	৫৪
"গুরু নাম সার করো" (সম্পাদকীয়)		৫৭

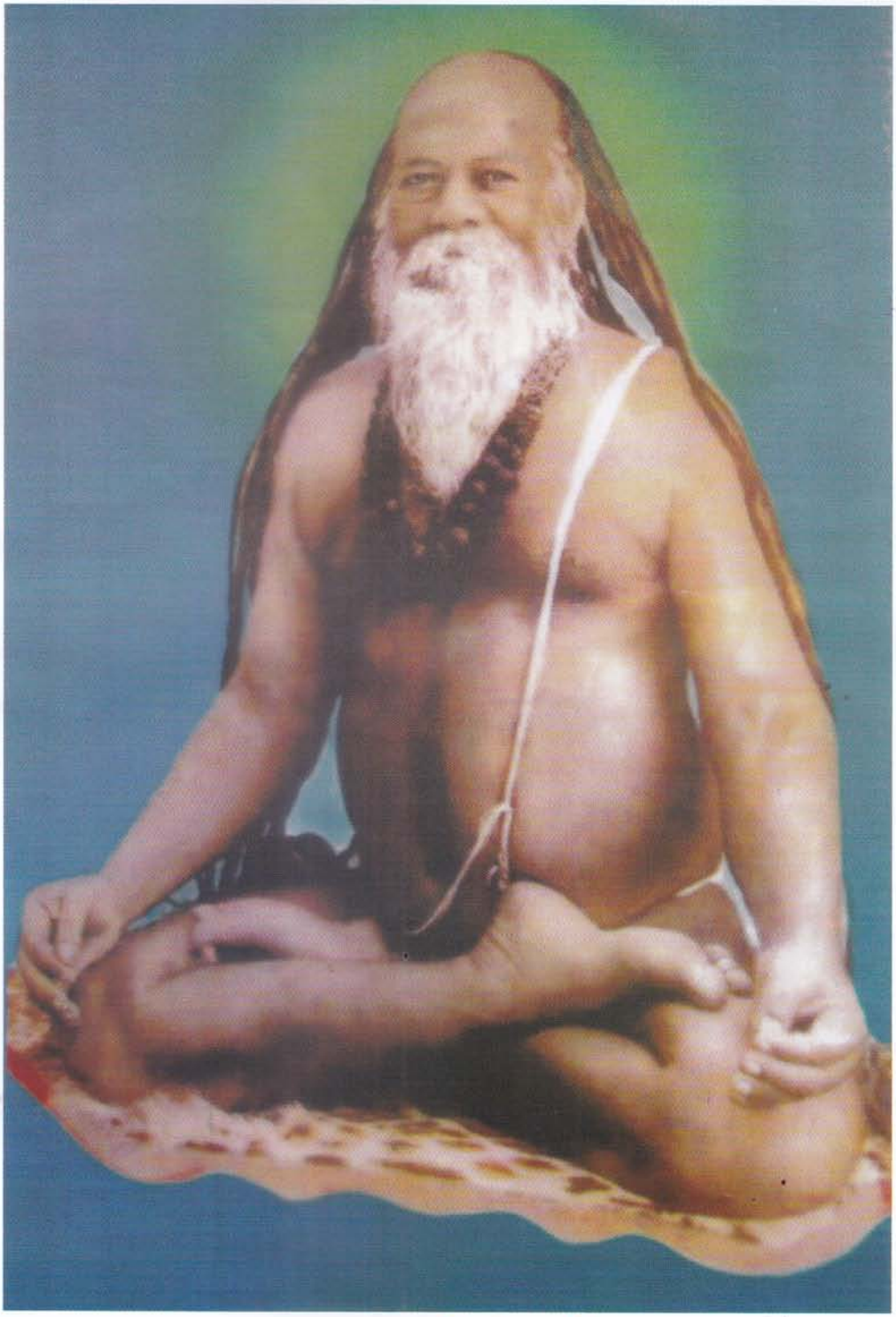

পরম শুভানুধ্যায়ী জনৈকা শিষ্যা

সতাং প্রসঙ্গ

সিমলায় ডাক বাংলোতে কয়েকজন অবাঙ্গালী পদস্থ কর্ম্মচারীর প্রশ্নোত্তরে:—

প্রশ্ন— বর্ত্তমানে ভারতের যে দুরবস্থা তার কারণ ও প্রতিকার কি?

শ্রীমহারাজ— ভারতের সব দিক দিয়েই যে সমস্যা জটিল পরিস্থিতি দেখা দিয়েছে তার কারণ ঐতিহ্য থেকে, নিজস্ব আধ্যাত্মিক ধারা থেকে ভারতবর্ষ নিজেকে অনেক দূরে সরিয়ে এনেছে। পুনরায় সেই ধারার সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্র স্থাপনই এর প্রতিকার।

প্রশ্ন— ভারতের অতীতকালে যে গৌরব, যে সুযোগ্য বীরপুরুষের কাহিনী আছে, সে তো ভারতেরই তবে আমরা সব ব্যাপারেই এত হীন হয়ে গেলাম কেন?

শ্রীমহারাজ— ঐ একই কারণে, নিজের ঐতিহ্যকে ভুলে যাওয়াই এর মূল। পাশ্চাত্য ধারার সংস্পর্শে এসে আমরা অনেকে আমাদের নিজস্বতা বিসর্জন দিয়েছি। যে আধ্যাত্ম সম্পদ আমাদের প্রাণস্বরূপ ছিল তা থেকে নিজেদের বিচ্ছিন্ন করেছি এর ফলে নিজেদের মূলে আঘাত করে মৃতকল্প হয়েছি। যে জাতি নিজেদের বৈশিষ্ট ত্যাগ করে অপরের অনুকরণ করে তার কোথাও স্থান নেই।

প্রশ্ন— মহারাজ, এই হীনতা কেমন করে ধীরে ধীরে আমাদের মধ্যে বিরাট করে দেখা দিল? এর ভবিষ্যতই বা কি? প্রথমেই তো আমরা খারাপ ছিলাম না, তবে খারাপের প্রেরণা এল কোথা থেকে?

শ্রীমহারাজ— যতদিন আমরা বেদের প্রতি আস্থাবান ছিলাম, ভগবানের অনুভবের সঙ্গে নিজেদের জীবনকে নিয়ন্ত্রিত ও বিশুদ্ধ রেখে চলতাম, ততদিন জাগতিক কোন ব্যাপারেই অপমানিত ও অসার্থক ছিলাম না। ক্রমে বিধর্মীর প্রেরণায়, ভয়ে, মোহে নিজেদের চারিত্রিক শিথিলতার সঙ্গে সঙ্গে বেদ বাক্যের প্রতি সংশয় এমনকি ঈশ্বরের অস্তিত্বের প্রতিও সন্দেহাকুল হয়ে পড়লাম। অনায়াসে ভোগ ও আপাত সুখের মরীচিকায় নিজধর্মকে অশ্রদ্ধা করতে শুরু করলাম। ভগবান সব কর্মেরই প্রতিফল দেন, ভাল ও মন্দ কাজের জন্য ভাল ও মন্দ ফল পেতেই হবে। আমাদের সুদীর্ঘ দিনের দুষ্কৃতি, অন্যায়, হঠকারিতার জন্য এমন ব্যাপকভাবে আমাদের দুর্ভোগ পেতে হচ্ছে, বিশ্বের শ্রেষ্ঠ জাতি সমূহের কাছে আজ আমরা লাঞ্ছিত ও পরাজিত। নিজেদের ঘরেও আমাদের শান্তি নেই, সান্ত্বনা নেই, অর্থ নেই, মান নেই, অন্ন, স্বাস্থ্য, পরিচ্ছন্নতা কিছুই নেই। তবু এখনও আমরা সম্পূর্ণ কলিকবলিত নই, এখনও গঙ্গার প্রতি লোকের শ্রদ্ধা আছে, কোথাও কোথাও ভগবানের প্রতি পূর্ণ বিশ্বাসও আছে। এও যখন দূর হয়ে যাবে তখনই ঘোর কলি।

প্রশ্ন— মহারাজ, এককথায় বলুন আমাদের বর্ত্তমান অবস্থায় একমাত্র কর্ত্তব্য কি?

উত্তর— শ্রীমহারাজ— অনেকক্ষণ চিন্তামগ্ন মুখে চুপ করে থেকে বললেন— কায়মনোবাক্যে নৈতিক শুদ্ধতা রক্ষা করা আমাদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

প্রশ্ন— স্বামিজী, ভগবানকে ডাকার সহজ উপায় কি?

উত্তর— যে কোন দেবতার নাম, যা আমার প্রিয়, তারই বারংবার স্মরণ।

প্রশ্ন— আমাদের মন সর্বদাই নানা কাজে, নানা ব্যাপারে ব্যস্ত, ভগবানকে একবার ডাকি তারপরই ভুলে যাই। বিপদে মনে পড়ে, আবার সর্বদা ভাবতে পারি না, ইচ্ছাও করে না।

শ্রীমহারাজ— এরজন্য চাই অনলস চেষ্টা, গীতায় একেই বলেছেন অভ্যাস যোগ। আমাদের মন চঞ্চল, বিক্ষেপের বিষয়ও নানারকম সুতরাং তাকে বারংবার আন্তরিক চেষ্টার দ্বারা একাগ্র করা চাই, প্রথম প্রথম অসম্ভব বলে মনে হবে। কিন্তু দীর্ঘ দিন এর পিছনে লেগে থাকলে সবই যেন স্বাভাবিক হয়ে যাবে। ঘুমোবার সময়ও যেমন আমরা বিনা চেষ্টায় শ্বাস প্রশ্বাস চালিয়ে যাচ্ছি, তেমনি চলি ফিরি, কাজ করি নিজের অজান্তে ভেতরে ভেতরে ভগবানের নাম ধ্বনিত হতে থাকবে। অভ্যাসের দ্বারা এতদূর হতে পারে।

প্রশ্ন— যে কোন কাজ করার আগে আমরা লাভক্ষতির বিচার করে তবে সে কাজে উৎসাহ পাই। ভগবানের নাম নিলে তো আমাদের কোন লাভ হয় না। বরং অনেক সময় দেখা যায় অধর্মচারীও সুখ সৌভাগ্যের চূড়ায় বসে আছে আর ভগবানকে ডেকে ডেকেও কারও দুঃখ দুর্দ্দশার শেষ নেই।

শ্রীমহারাজ— আমাদের পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মের কর্মফল কখনও কখনও পরের জন্মে ভোগ করি। যে অধার্মিক অথচ বর্ত্তমানে সুখী তার পূর্ব্ব সুকর্মের ফলই সে এখন ভোগ করছে। কিন্তু বর্ত্তমান অনাচারের দণ্ড পরে তাকে পেতেই হবে। যে নিষ্ঠাবান সংসারে পরাজয় ও হতাশা বরণ করেছে তারও সদাচারের পুরস্কার পেতে হবে, হয়ত পূর্ব দুষ্কর্মের উৎকট ফলই এভাবে তাকে দুঃখ দিচ্ছে। এক হিসেবে সুখ দুঃখের কর্ত্তা ভগবান নন, আমরাই— কারণ প্রত্যক্ষভাবে ভালমন্দ কাজের প্রেরণা ভগবান দেন না। তিনি আমাদের বিবেক দিয়েছেন ভালমন্দ বিচারের জন্য তবে আমরা মন্দ কাজ করে নিজের দুর্ভাগ্য কেন ডেকে আনি? ইচ্ছে করলেই সুকর্মের দ্বারা সৌভাগ্য পেতে পারি।

অবশ্য ভগবানের নাম করলে আমাদের হাতে হাতে কোন সুফল আমরা নাও পেতে পারি। কিন্তু যখন দেখি এছাড়া আর অন্য পথে শান্তি পাচ্ছি না, যখন দেখি ভগবানের নাম নিতে নিতে ক্রমশঃ আমার মন জগতের লাভ-ক্ষতি, সুখে-দুঃখে বিচলিত না হয়ে এক অবিচল শান্তি পাচ্ছে তখন একে ছাড়তে ইচ্ছে করে না। নিভৃত গোপন সুখের মত এ তখন আমার হৃদয়ের গভীর দেশ থেকে আমায় সঞ্জীবিত করে, পাথেয় যোগায়, বাইরের জগতের প্রতি তখন সহজেই উদাসীনতা আসে।

প্রশ্ন— কিভাবে গুরু শিষ্যের নিগুঢ় সম্পর্ক সৃষ্টি করা যায়?

উত্তর— শ্রীগুরু ও শিষ্য সম্বন্ধ একতরফা নহে। আলোক ও অন্ধকার, দাতা ও গ্রহীতা, Positive Negative বা অনুগ প্রতিগ এই সম্বন্ধ পরস্পর সাপেক্ষতা লইয়াই আত্মপ্রকাশ করে। রূপ ও চক্ষু উভয়েই রূপানুভূতির অচ্ছেদ্য সাপেক্ষ অঙ্গ। তাই শ্রীগুরু সকলের মধ্যে আত্মদর্শন করিয়া ব্রহ্মময় অনুভূতি দ্বারা নিরপেক্ষ কারুণ্য বিতরণ করিলেও, সেই কারুণ্য উপলব্ধি করিবার জন্য শিষ্যের পাত্রতারও আবশ্যক আছে, বরং দ্রোণাচার্য্য ও একলব্যের উপাধ্যানে শ্রীগুরু দ্বারা প্রাপ্ত নিষ্কারুণ্য ভাব পাইয়াও শিষ্য তার ভক্তি ও বিশ্বাস বলে গুরুর শক্তি ও কারুণ্য আহরণ করিতে পারিয়া ছিলেন। শিষ্য হাতেপায়ে ধরিবার জন্য তখনই উদ্যত হইবে যখন সে নিজের দুর্ব্বলতা অপারগতা ও অবরত উপলব্ধি করিয়া

পরবর্তী অংশ ৩৪ পৃষ্ঠায়ঃ

গীতার মর্ম (পরবর্তী অংশ)

শ্রীদেবপ্রসাদ রায়

হে ভগবত! তখন হৃষিকেশ হাসতে হাসতে উভয় সৈন্যদলের মধ্যে বিষাদগ্রস্ত অর্জুনকে সম্বোধন করে বললেন।

ব্যাখ্যা-ভগবানের সখা হয়েও অর্জুন ভগবানের বশীভূত হয়েছেন। যে মহাযুদ্ধে বিজয়লাভের জন্য অর্জুন বনবাসকালে কঠোর ব্রত করে ইন্দ্রিয়াস্ত আদির অমোঘ প্রয়োগকৌশল শিক্ষা করলেন এবং পূর্ব হতে কত উদ্যোগ কত উৎসাহ করে এসেছেন, আজ সেই মহাবীর কেশরীকে নিশ্চেষ্টবৎ উপবিষ্ট দেখে শ্রীকৃষ্ণ না হেসে থাকতে পারলেন না।

অর্জুন ভক্ত বটে কিন্তু তাঁর হৃদয়ে ভক্তিভাব এতক্ষণ সমাবৃত ছিল। অহঙ্কার, ক্রোধ, মোহ, হৃদয়দৌর্বল্য প্রভৃতি রজস্তমো গুণজাত মোহের আড়ালে পড়ে অর্জুনের ভক্তিভাব অপ্রকাশিত ছিল। তিরস্কারের আড়াল দিয়ে যে কৃপার বাতাস এসেছে, তাতে ঐসব আবরণ উড়ে গিয়েছে। তাই এখন অর্জুনের হৃদয়ের সহজ স্বাভাবিক ভক্তি আত্মপ্রকাশ করেছে। ভক্তি ভগবানকে উদয় হতে বাধ্য করেছে। মহামতি সঞ্জয় অবস্থাটি বুঝতে পেরে বলেছেন, গুড়াকেশ তূষ্ণীম্বভূবহ —অর্জুন চুপ করেছেন। আর অমনি তমুবাচ হৃষীকেশঃ-হৃষীকেশ কথা বলছেন।

সঞ্জয় যেন জানাচ্ছেন, অর্জুন কথা বলা বন্ধ না করা পর্যন্ত হৃষীকেশ কথা বলতে পারছিলেন না। পারবেন কি করে? যে কোন ভদ্র সমাজেই এককালে দু'জনের কথা বলা অভদ্রতা। যতক্ষণ আমরা কথা বলি, কোলাহল করি, আপনাকে জাহির করি, ততক্ষণ তিনি নীরবই থাকেন। আর যখন আমরা নীরব হয়ে যাই, তখন তাঁর মুখে কথা ফোটে। কেবল নীরব হলেই হয়না, আমরা বুদ্ধিহীন বুঝে যখন তাঁর কথা শুনবার জন্য ব্যাকুল হই, আমরা শক্তিহীন মনে করে যখন তাঁর চরণে প্রপন্ন হই (শরণাগত হই), তখনই তিনি কথা বলেন। চিরকালই তাঁর এই ধারা। যে যে পরিস্থিতিতে Condition এ তিনি কথা বলেন, সেসবগুলি এবার উপস্থিত হয়েছে, তাই হৃষীকেশ এবার কথা বলছেন। এরপরই আমরা পাই দ্বিতীয়বার শ্রীভগবান উবাচ। মুখর মানুষের/অন্ধ সমাজের দিকে তাকিয়ে সঞ্জয় যেন ইসারায় বলছেন, অর্জুন চুপ করেছেন, এখন তোমরাও চুপ কর। নীরবে শোন, সবচেয়ে মূল্যবান কথা আসছে। শ্রীভগবান বলছেন।

শ্রীভগবানে কথা আরম্ভ হল। এবারকার কথার মধ্যে তীব্রতা নেই, কর্কশতা নেই, তিরস্কার নেই। আছে শুধু প্রাণে প্রীতি মাখানো দরদ আর শ্রীমুখে মধুমাখানো হাসি। দিব্যদৃষ্টি সঞ্জয় সে হাসিটুকু লক্ষ্য করেছেন, তাই বলছেন, প্রহসন্নিব।

সংসারের অধিকাংশ মানুষই নিজেকে বেশ বুদ্ধিমান মনে করে। কোন সমস্যায় পড়ে উপদেষ্টার কাছে পরামর্শ নিতে গিয়েও সে নিজ বুদ্ধির অভিমান ত্যাগ করতে পারেনা। উপদেষ্টার উপদেশ নিজের মনের

মত হলেই গ্রহণ করে। মনোমত না হলে নানা অজুহাত দেখিয়ে ত্যাগ করে সাধারণ লোক খেয়ালে চলে, উপদেশে চলেনা। এক্ষেত্রে অর্জুনের যে স্বভাব প্রকাশ হয়ে পড়েছে, তা নিতান্ত সাধারণ মানুষেরই মত।

প্রথমতঃ সাধারণের মতই আত্মীয়-স্বজনের মুখ চেয়ে মোহগ্রস্ত হলেন। দ্বিতীয়তঃ সাধারণের মতই দিশাহারা হয়ে মঙ্গলের পথ খুঁজে না পেয়ে 'আমি শরণাগত, আমায় পথ দেখাও' এই কথা বললেন। তৃতীয়তঃ শরণাগত হয়ে ন যোৎস্য যুদ্ধ করবই না বলে নীরব হওয়া অতিসাধারণোচিত কার্যই হয়েছে। 'আমার কিসে কল্যাণ হবে, আমি জানিনা, তুমি বল'। এই ভূমিকা করার পর গুরুর নিকট সদুপদেশ প্রর্থী হয়ে পুনশ্চ, 'আমি যুদ্ধ কিছুতেই করব না', এই ধরণের উক্তি কেবল অশোভন নহে, নিতান্তই হাস্যজনক। এরকম কথা বলার পর উপদেশ প্রার্থীকে নিশ্চয়ই কোনও মানুষ উপদেশ দেয়না। ভগবান বলেই তিনি উপদেশ দিলেন। অর্জুনের অবস্থাটি দেখে একটু হাসলেন মাত্র।

সেই হাসিটুকু দ্বারা যেন আমাদের বললেন, 'হে জীব, তোমাদের চিত্তের অবস্থা একান্তই হাস্যোদ্দীপক। আমার চরণে শরণাগত হয়ে, কোন্ পথশ্রেয়ঃ, তা নির্ণয়ের ভার আমার উপরে দিয়ে পুণরায় অহংবুদ্ধিতে সেই অবনত মাথাকে তুলে নিয়ে যুদ্ধ কিন্তু কিছুতেই করব না, এ ধরণের ভক্তি তোমাদের স্বভাবজাত। তোমরা আমার কাছে অভিমানের মাথাটি বেশীক্ষণ নীচু করে রাখতে পারনা। যাহোক, কোন ঘটনার চাপে একটিবারও যদি মাথা নীচু কর, তাহলেই আমি ধরব, আবার মাথা তুলে নিলেও ছাড়ব না।

সাধক বিষাদে পীড়িত হবার পর বিচারের ভার নিজের উপর নিয়ে যখন চারদিক অন্ধকার দেখে, কর্তব্য, অকর্তব্য বিচার করতে না পেরে বিরাট বিশ্বব্যাপী শক্তির দিকে চেয়ে কর্মে একেবারে পূর্ণরূপে নিরস্ত হতে চায়। যখন সে আর নিজে বিচার করতে সমর্থ না হয়ে, নিজের জীবভাবের দ্বারা কর্তব্য নির্ধারণের উপায় নেই বুঝে হৃদয়ের গুরুর চরণে লুটিয়ে পড়ে, তখন সে দেখে যাকে ক্ষুদ্র জীবের ক্ষুদ্র হৃদয়স্থ গুরু বলে বসিয়েছে, সে তার একার গুরু নহে, সে যে বিশ্বগুরু-বিশ্বচরাচরের মন্ত্রদাতা।

এইভাবে ভগবানকে গুরু বলে চিনবার পর সাধকের প্রাণ ভগবৎ ভক্তির বিশালত্ব অনুভব করে স্বীয় চেষ্টা শক্তিতে তাতে ভাসিয়ে দেবার সঙ্কল্প করে। তবে এটা নির্ভরতা নহে, এটা আসক্তি বা ভক্তির আত্ম ত্যাগও নহে, সে অবস্থা আসতে এখনও অনেক দেরী আছে। এটা অসমর্থ্যের আত্মসমর্পণ- এটাঅশক্তের নির্ভরতা।

এটাই সাধনার দ্বিতীয় অবস্থার উন্মেষণ। আত্ম-প্রতিষ্ঠার ইচ্ছা রয়েছে, অথচ যুক্তি ও সহজ জ্ঞান মায়া বিজড়িত হয়ে তার হৃদয়কে তার বিরুদ্ধে উত্তেজিত করছে। এইরূপ সঙ্কটে পড়েই সে সাধক তখন ভগবানে আত্মসমর্পণ করতে সঙ্কল্প করে কুল পাচ্ছেনা বলেই সে স্রোতে গা ভাসিয়ে দিচ্ছে, একে যথার্থ নির্ভরতা বলে না। প্রাণে অন্য কোন ইচ্ছা বলবতী থাকতে অন্য বস্তুর উপর আসক্তি থাকতে ভগবানে আত্মসমর্পণ আসেনাঃ আমি আত্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করব, এইরকম উদ্দেশ্য অভ্যন্তরে নিহিত থাকায় আত্মকর্তৃত্ব এসে পড়ে। প্রাণ উদ্দেশ্যশূন্য হয়ে যখন ভগবানে নির্ভর করে, তখনই যথার্থ ভগবানে আত্মসমর্পণ হয়। সে অবস্থা সাধকের হতে দেরী হয়। বিষাদের পর দ্বিতীয় অবস্থায় আমিত্ব-শক্তির দুর্বলতা বুঝে ভগবৎ-শক্তির প্রবল স্রোতের মুখে দাঁড়াতে অক্ষম জেনে সাধক যেন ক্ষুণ্ণভাবে ভগবানে আত্মসমর্পণ করে। এটা অক্ষম বুঝে আত্মত্যাগ।

এরূপ আত্মত্যাগেরও মহাফল আছে। এই ভয়ে ভক্তি হতে যথার্থ ভক্তি ক্রমশঃ আসতে পারে। এই ভগবৎ শক্তির অনুভব ধীরে ধীরে যত গাঢ় হতে গাঢ়তর হয়, নির্ভরতা সেই অনুপাতে ক্রমশ ঘনীভূত হতে থাকে।

জীব এই সময়ে চেষ্টাশক্তির পরাধীনতা ও বিরাট শক্তির সর্বত্র অক্ষুণ্ণ আধিপত্য বুঝতে আরম্ভ করে। তখন তার প্রাণ উদাস হয়ে পড়ে। উদাসীন ভাব, সর্ব-বিষয়ে অনাস্থা, চিত্তের নির্জীবতা, বিষণ্ণতা এই সকল এই অবস্থার লক্ষণ। এটা বৈরাগ্যের আভাস মাত্র, বৈরাগ্য নহে।

ক্রমশঃ

---

৩১ পৃষ্ঠার শেষাংশ

শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস সহকারে তদপেক্ষা অধিকতর প্রতীয়মান ও অনুভূয়মান শক্তিসম্পন্ন আধারে আত্মসর্মপণ করিতে পারিবেন। তখনই শিষ্য শ্রীগুরুর কৃপা অনুভব করিতে পারিবেন।

"কার্পণ্য দোষোহপত স্বভাব:
পৃচ্ছামি ত্বাং ধর্ম্ম সংমূঢ়চেতাঃ
যচ্ছ্রেয় স্যান্নিশ্চিতং ব্রুহিতম্মে
শিষ্যস্তেহহং শাধি মাং ত্বাং প্রপন্নম্।"

শিষ্যের মধ্যে প্রকৃত শ্রেয়ঃ লাভের অদম্য আকাঙ্খা জাগিবে, যখন নিজের বুদ্ধি বিচারণা দ্বারা সেই শ্রেয়ঃ পথ সন্ধান করিতে পারিবে না তখনই তদপেক্ষা বরণীয় আধারে প্রপন্ন হইয়া থাকেন এবং এইরূপ প্রপন্ন চিত্ত শিষ্যই শ্রীগুরুর কৃপা লাভ করিতে পারেন। আধার ব্যতীত আধেয় বস্তু থাকিতে পারে না, শ্রীগুরু মাধ্যমে ভগবানের অনন্ত শক্তির বিচ্ছুরণ ও বিকিরণ শিষ্যের আধারে অনুরূপই আত্মপ্রকাশ করে। 'গুরু মিলে লাখ লাখ চেলা মিলে না এক'। গুরু অনেক হইতে পারেন কিন্তু প্রকৃত শিষ্য পাওয়া দুর্লভ। শ্রীগুরু ও শিষ্য উভয়ই যদি মার্জ্জিত শক্তি ও সংস্কারাপন্ন হন তবেই মণি কাঞ্চন যোগ হইতে পারে। তাই এই সম্বন্ধ একতরফা নহে এ সম্বন্ধ অন্যোন্য সাপেক্ষ।

স্মৃতির আলোকে বিগতদিন (পূর্বপ্রকাশিতের পরবর্তী অংশ)

শ্রদ্ধেয় সৌরেন্দ্রনাথ মিত্র

আমরা শ্রদ্ধেয় অজিত সোমের লেখা 'মহারাজ' বইতে শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীর এক সময়ে দার্জিলিং অবস্থানকালে ঐ অঞ্চলের ভয়ঙ্কর ধ্বসের বিবরণ পড়েছি। তখন অজিতদা ও আরও কয়েকজন গুরুমহারাজজীর সঙ্গী হয়ে গিয়েছিলেন। আর ওনাদের যাঁরা রেসকিউ করতে গিয়েছিলেন তাঁদের দলে ছিলেন আমাদের শ্রদ্ধেয় ভীষ্মদা।

এ যেন সেই আমেরিকার দিক থেকে নায়েগ্রা দেখা আর কানাডার দিক থেকে নায়েগ্রা দেখার মত। এখন দেখা যাক ভীষ্মদা কী লিখেছেন তাঁর সম্ভার থেকে।

আমি এর পুর্বে যে সময় পাকুড়ে অবস্থানের কথা লিখেছি, সেবারে মহারাজজী পাকুড় থেকে ভাগলপুরে গিয়েছিলেন এবং আমাকে ও সলিলকে কৃপা করে সঙ্গী করে ভাগলপুর নিয়ে গিয়েছিলেন। সেখানে আমার অবস্থান হয়েছিল অজিতের (সোম) গৃহে এবং সলিল উঠেছিল প্রয়াত হরেনদার (দাস) গৃহে। যতদূর মনে পড়ছে সেবারে মহারাজজীর ভাগলপুরে অবস্থান হয়েছিল হরেনদার গৃহে। মহারাজজী সেবার ভাগলপুর ঘুরে যথারীতি দেওঘর আশ্রমে দুর্গাপূজা সমাপন করে দার্জিলিং পরিভ্রমণে যাত্রা করেছিলেন। সেবার অজিতই মহারাজজীর সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল তাই সেখানে তাঁর অবস্থান হয়েছিল মহারাজজীর অবস্থান গৃহের গৃহকর্তার গৃহে। আমি উঠেছিলাম আরও উচ্চে প্রয়াত গোবিন্দ বাবুর (ঘোষ) গৃহে।

এর পরের বৎসর ইং ১৯৫০ সালে জুন মাসে মহারাজজী পুনরায় দার্জিলিং পরিভ্রমণে গিয়েছিলেন। অবস্থান করেছিলেন সেই একই গৃহে। অজিতও স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর সঙ্গী হয়ে গিয়েছিল। আজ লিখতে বসে সেই গৃহ যেন চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। গৃহের সম্মুখে সুন্দর Lawn, একধারে গৃহকর্তার বাসগৃহ ও অন্যধারে Out house সেই Out house-এ হোত মহারাজজীর অবস্থান। আমার সব চেয়ে ভাল লেগেছিল যে মহারাজজীর অবস্থান কক্ষের সঙ্গে গৃহকর্তার অবস্থান গৃহের কোন যোগাযোগ ছিল না।

এই ১৯৫০ সালেই ঘটেছিল দার্জিলিং এর সেই ভয়াবহ বিধ্বংসী কাণ্ড। ভীষণ ধ্বসের মুখে পড়েছিল দার্জিলিং। কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং কি রেলপথ, কি মোটর পথ সমস্ত পাহাড়ী এলাকা ধ্বংসের মুখে পড়েছিল। একেবারে অতল গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছিল। সেই সময়ে দার্জিলিং এ প্রবেশ বা নির্গমন দুই-ই বন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

মহারাজজী সে সময় প্রতি বৎসরই রথযাত্রা উপলক্ষ্যে পুরীধাম পরিভ্রমণে যেতেন। সেবারে যখন ঐ

বিধ্বংসী ধ্বস নেমেছিল, মহারাজজী তখন দার্জিলিং-এ। তিনি সেখানে আটকে পড়েছিলেন। ক্রমশঃ রথযাত্রার দিন এগিয়ে এসেছিল। মহারাজজী কলকাতায় ফিরে আসার জন্য খুব ব্যস্ত হয়েছিলেন। কলকাতায় অজিতের চিঠি মারফৎ খবর এসেছিল মহারাজজীর পুরী যাওয়ার ব্যস্ততার কথা। মহারাজজীকে যদি কোন উপায়ে দার্জিলিং থেকে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া যায় তার কোন ব্যবস্থা করার চেষ্টা করতে আদেশ পাঠিয়েছিলেন।

কলকাতায় এই খবর পৌঁছানো মাত্র, তখনকার দিনে যাঁরা মহারাজজীর যাতায়াতের ব্যবস্থা করতেন (এখনকার ভাষায় VIP) তাঁরা শুরু করেছিলেন ঘন ঘন Meeting মহারাজজীকে তখন প্রায় অগম্য, সেই দার্জিলিং থেকে কি করে ফিরিয়ে আনা যায়। শেষ পর্যন্ত Meeting এ ঠিক হয়েছিল যে কলকাতা থেকে কয়েকজন যে করেই হোক দার্জিলিং যাবার চেষ্টা করবেন ও মহারাজজীকে যে করেই হোক কলকাতায় ফিরিয়ে আনবেন।

কিন্তু কে কে যাবেন, সেটা আর কিছুতেই স্থির হচ্ছিল না। যাঁকেই মনোনীত করা হচ্ছিল সে সময়, শোনা যাচ্ছিল সে ব্যক্তির সে সময়ে এত কাজ যে তাঁর পক্ষে কিছুতেই সে সময়ে কলকাতা ত্যাগ করে যাওয়া সম্ভব নয়। কারও কাছে শোনা গিয়েছিল যে সে সময়ে নাকি অফিসে ছুটি পাওয়া অসম্ভব। সেই সময়ে প্রত্যহ দৈনিক সংবাদপত্রে ঐ ভয়ংকর ধ্বসের অনেক ভয়াবহ ছবি প্রকাশিত হয়েছিল। হয়ত সে সব ছবিই তাঁদের পক্ষে যাওয়ার অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছিল।

সবচেয়ে কৌতুক অনুভব করেছিলাম যে যাঁরা সে সময় তাঁদের নানা কাজের বা ছুটির অছিলা দেখিয়েছিলেন, মহারাজজী যেদিন ফিরে আসেন, সেদিন সেই Air Port এই তাঁদের বলতে শুনেছিলাম— "কৈ আমাদের তো সে রকম জোর দিয়ে বলা হয়নি। মহারাজজীকে আনার প্রয়োজনে আমরা যে করে হোক যেতাম।" অর্থাৎ যখন তাঁরা দেখেছিলেন যে দৈনিক পত্রিকায় যতই ভয়াবহ ধ্বসের চেহারা প্রকাশিত হোক, তারমধ্য থেকেই মহারাজজীকে নির্বিঘ্নে ফিরিয়ে নিয়ে আসা সম্ভব হয়েছিল, তখন বোধহয় তাঁদের আপশোষ জেগেছিল।

শেষ পর্যন্ত Meeting-এ চারজনের একটি দল স্থির হয়েছিল, যাঁরা মহারাজজীকে ফিরিয়ে আনতে যাবেন। আমার মনে আছে এই চারজন কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে রাজী হয়েছিলেন। তবে যে চারজন সর্বসম্মতিক্রমে Selected হয়েছিলেন, আমার ধারণা তাঁদের একজনেরও এই রকম Expedition-এর অভিজ্ঞতা ছিল না। সে রাস্তা যে কি ভীষণ ভয়াবহ ছিল আজকের দার্জিলিং দেখে ধারণাই করতে পারা যাবে না। সেই চারজনের দলে আমার নাম Select করা হয়েছিল। আমার নিজের সেই যাত্রার অভিজ্ঞতায় আমি স্থির নিশ্চিত যে মহারাজজী ফিরে আসতে ইচ্ছুক হয়েছিলেন, তাঁর সেই ইচ্ছা শক্তিই আমাদের দার্জিলিং-এ তাঁর শ্রীচরণে হাজির করিয়েছিল এবং সকলে নিরাপদে ফিরে এসেছিলাম। যে চারজন সেই দলে Select হয়েছিলেন তাঁরা হলেন—

১। শ্রীঅমর বসু (নলেদা), ২। শ্রীসলিল মিত্র (বিষ্টু), ৩। প্রয়াত শিশির বসু, এবং ৪। শ্রীসৌরেন্দ্রনাথ মিত্র (ভীষ্ম)।

আমাদের দার্জিলিং যাওয়ার কুড়ি-একুশ দিন পূর্বে জন্মগ্রহণ করেছিল আমার কন্যা 'অঞ্জনা' (অঞ্জু)। নবজাতা কন্যা ও আমার স্ত্রী তখন আমার শ্বশুরালয়ে। আমি আমার এই দার্জিলিং যাওয়ার কথা তাদের

জানিয়ে যাইনি। আমার যাওয়ার তিন দিন পরে তাঁরা আমার যাওয়ার খবর পেয়েছিলেন এবং স্বাভাবিক ভাবেই উদ্বিগ্ন হয়েছিলেন। হয়ত আমার সে সময়ে মনে হয়েছিল, যে তারা সংবাদ পেলে আমার যাওয়ার বাধা সৃষ্টি হতে পারে, তাই হয়ত তাদের না জানিয়ে চলে গিয়েছিলাম।

আজ চিন্তা করে দেখছি যে সে সময় তো আমরাও দৈনিক সংবাদপত্রে রোজই ঐ সব ভয়াবহ সংবাদ পড়তাম বা সেই সব ছবি দেখতাম। কিন্তু আমাদের মনে তো কোন ভয় বা দুশ্চিন্তা আসেনি। আমাদের চারজনের মধ্যে কার কি মনে হয়েছিল ঠিক বলতে পারি না, তবে আমার মনে যে বিন্দুমাত্র দ্বিধাবোধ আসেনি সেটা পরম সত্য। তখন মনে একমাত্র আনন্দ যে মহারাজজীর কাছে যাবার সুযোগ পাচ্ছি। তবে মনে পড়ছে আমার পিতৃদেবও কিন্তু আমার যাওয়া নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা করেননি বা চিন্তা করেন নি বরং তিনি এই দলে যোগ দিয়ে দার্জিলিং যেতে প্রস্তুত ছিলেন প্রয়োজন হলে।

আমাদের চারজনের মধ্যে নলেদা অর্থাৎ অমরবাবু ছিলেন খেলাধূলা জগতের লোক কিন্তু তাঁকে দেখেছিলাম কোন বিষয়ে স্থির সিদ্ধান্তে আসতে পারতেন না। অতি ভদ্রলোক, তবে একটু ভীতু প্রকৃতির লোক। তাঁকেই আমাদের দলপতি করে পাঠানো হয়েছিল। আমরা শিলিগুড়ি পর্যন্ত প্লেন এ গিয়েছিলাম এবং বাগডোগড়া এয়ারপোর্ট থেকে ট্যাক্সি নিয়েছিলাম। মনে পড়ছে সেই এয়ারপোর্টে গিয়ে জেনে ছিলাম যে ট্যাক্সি কার্শিয়াং পর্যন্ত যাবে। তারপর আর যাওয়া যাবে না। পথ একদম ধ্বসে গেছে। আমরা তাই কার্শিয়াং পর্যন্তই এগিয়ে যাব স্থির করে একটা ট্যাক্সি ঠিক করে যাত্রা করেছিলাম। আসল ধ্বসটা নেমেছিল কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং পর্যন্ত অংশে, তবে বাগডোগড়া থেকে কার্শিয়াং পর্যন্ত রাস্তাও এই ধ্বস থেকে রেহাই পায়নি। আমাদের ট্যাক্সি এই রাস্তায় বহুবার চরম বিপদ থেকে রক্ষা পেয়েছিল। বাঁচাতে গিয়ে আমাদের ট্যাক্সি চলে গিয়েছিল রাস্তার একদম ধারে, যার পাশে ছিল অতলান্ত খাদ। আমাদের ট্যাক্সি কোন রকমে পার হতেই সেই স্থানের পাথর ও রাস্তার খানিকটা সেই খাদে ভেঙে পড়েছিল।

কার্শিয়াং এ পৌঁছে শুনেছিলাম যে এর পরে আর পথ বলে কিছু নেই। দার্জিলিং-এ পৌঁছানো অসম্ভব। তখনও কিন্তু মনে কোন ভয় বা চিন্তা আসেনি। হয়ত বা তখনও ধ্বসের আসল চেহারাটা ছিল আমাদের অজানা। তবে আজ মনে পড়ছে যে নলেদা বোধহয় কেটু ভয় পেয়েছিলেন, কারণ তাঁর উপরেই ন্যস্ত ছিল আমাদের সকলের ভার এবং আমরাও ছিলাম তাঁর কার্যের উপর নির্ভরশীল। পথের খবরাখবর তিনিই রাখছিলেন। পথের ভয়াবহতার কথা শুনে তিনি খুবই ভীত হয়ে পড়েছিলেন এবং আমাদের সঙ্গে কোন পরামর্শ না করেই, আমাদের অজ্ঞাতসারেই, নিজের বুদ্ধিতে কার্শিয়াং থেকে দার্জিলিং-এ মহারাজজীর নামে একটা টেলিগ্রাম পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। তাতে মহারাজজীকে জানিয়েছিলেন যে আমরা তাঁকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে কার্শিয়াং-এ এসে পৌঁছে গেছি। শোনা যাচ্ছে সামনের রাস্তা অত্যন্ত ভয়াবহ। আমরা কি এখানেই অপেক্ষা করব, কিংবা দার্জিলিং যাওয়ার চেষ্টা করব?

আজ লিখতে লিখতে বুঝতে পারছি যে সেদিন নলেদা সেই রাস্তার ভয়াবহতার কথা শুনে তাঁর স্বভাবজাত ভয়ে ভীত হয়েছিলেন এবং আশা করেছিলেন যে হয়ত মহারাজজী রাস্তার এই ভয়াবহতার কথা জানতে পারলে আমাদের কার্শিয়াং এই অপেক্ষা করতে বলবেন। সেই আশা নিয়েই দার্জিলিং-এ মহারাজজীকে টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন।

আজ ঠিক স্মরণে নেই, তার পরদিনই কিংবা তারও পরের দিন সেই টেলিগ্রাম এর জবাব এসেছিল টেলিগ্রামে।

START IMMEDIATELY-
GURU MAHARAJ

মহারাজজীর নাম করে এই টেলিগ্রাম এসেছিল বটে, কিন্তু এই টেলিগ্রাম মহারাজজীর অনুমতি না নিয়েই দার্জিলিং-এর মহারাজজীর অবস্থান গৃহের কোন ব্যক্তি মহারাজজীর নাম ব্যবহার করে আমাদের কাছে পাঠিয়েছিলেন। সেটা আমরা দার্জিলিং পৌঁছে মহারাজজীর সঙ্গে সাক্ষাতের সঙ্গে সঙ্গে জানতে পেরেছিলাম। আমরা কিন্তু ঐ টেলিগ্রাম পেয়ে সেটাকে মহারাজজীর প্রেরিত টেলিগ্রাম চিন্তা করে তৎক্ষণাৎ বোধহয় এক ঘণ্টার মধ্যে দার্জিলিং এর উদ্দেশ্যে যাত্রা করেছিলাম। আমাদের মনেই আসেনি যে মহারাজজীর নাম দিয়ে তাঁকে না জানিয়ে, তাঁর অজ্ঞাতে এ রকম মিথ্যা টেলিগ্রাম কেউ করতে পারে। আজ ভাবি যিনি এইভাবে মিথ্যা টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন তিনি কোন সাহসে এই কার্য করেছিলেন? জানি না পরে এই ঘটনা প্রকাশিত হয়ে যাওয়ার পর মহারাজজীর ক্রোধ ও অসন্তোষ দেখে তিনি অনুতপ্ত হয়েছিলেন কিনা?

কার্শিয়াং-এ যেখানে আমাদের অবস্থান হয়েছিল, সেখানের সকলেই আমাদের ঐ পথে দার্জিলিং না যাওয়ার জন্য বার বার অনুরোধ করেছিলেন কিন্তু আমরা তখন স্থির প্রতিজ্ঞ এবং নিশ্চিতভাবে ঠিক করেছি যে রাস্তা যত খারাপই হোক, যত ভয়াবহ মূর্তি ধারণ করে থাকুক, আমরা দার্জিলিং যাবই। মহারাজজী আদেশ করেছেন, আমরা ঠিক পৌঁছে যাব সেখানে, এই বিশ্বাস সেদিন আমাদের মরীয়া হতে উৎসাহিত করেছিল। হয়ত মনে বিশ্বাস ছিল, তাঁর ডাকে কোন বিপদ আমাদের স্পর্শ করবে না।

সেই পথ যে কি সাংঘাতিক বিপদ সঙ্কুল ছিল এবং সেদিন যে কিভাবে ঐ পথ পার হয়েছিলাম, তা আজও চিন্তার মধ্যে আনতে পারি না। আজ লিখতে বসে সেই পূর্ব দিনের সেই পথের কথা চিন্তা করে ও সেই পথের পাশে অতল খাদের দৃশ্য চোখে ভেসে ওঠায় শিহরণ জাগছে।

ক্রমশঃ

অমৃতবাণী

সত্ত্ব ভূমিতে উঠিতে না পারিলে ধর্ম্মের দরজাতেই পৌঁছন হইল প্রকৃত ভক্তি ঐ সত্ত্ব অর্থাৎ চিত্তের সমতা অবস্থাতেই লাভ হয়। সাধুসঙ্গের ফলে চিত্ত নিস্তরঙ্গ হয়। সাধু-সঙ্গ করিয়াও যদি চিত্ত অল্প জঞ্ঝাতেই দুলিয়া উঠে, সমভাবাপন্ন না হয়, তবে বুঝিতে হইবে সে চিত্ত জড় বা পাষাণ। সাধুসঙ্গের মহিমায় চিত্ত শুদ্ধ নির্ম্মল হইয়া স্থির হইবেই হইবে।

অভিশপ্ত অশ্বত্থামা

শ্রীমতী রীণা মুখোপাধ্যায়

শ্রীশ্রীগুরুপূর্ণিমা উপলক্ষ্যে শ্রীশ্রীগুরুচরণে জানাই আমাদের অনন্তকোটি প্রণাম। শ্রীগুরুমুখ নিঃসৃত হরিনাম, কৃষ্ণনাম, বাণী-যুগ যুগ ধরে আকাশে বাতাসে ধ্বনিত হতে থাকবে। বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে কৃষ্ণনাম ধ্বনি-প্রতিধ্বনি হয়ে ফিরে ফিরে আসে। কৃষ্ণনাম-কৃষ্ণকথা যত শুনব, জানব, ততই আমাদের ত্রিতাপ জ্বালায় জর্জরিত জীবন, মায়ায় জড়ানো বন্ধন হতে মুক্ত হয়ে শান্তির পথ খুঁজে পাবে।

শ্রীকৃষ্ণ নারদকে বললেন, কলিযুগে পুরুষ স্ত্রী নিয়ন্ত্রণাধীন হবে। কলিযুগে পাঁচ হাজার বছর পর গঙ্গা নদী শুকিয়ে বৈকুণ্ঠে ফিরে যাবে। আবার দশহাজার বছর সমস্ত দেব দেবী মর্ত্য ছেড়ে নিজের ধামে ফিরে যাবেন। সমস্ত ব্যক্তি ধর্মীয় কাজকর্ম করা বন্ধ করে দেবে। একসময় অন্ন ও ফলের উৎপাদন বন্ধ হয়ে যাবে চারি দিকে হিংসা-মারামারি অনৈতিকতার প্রসার হবে এই যুগের প্রতিটি ব্যক্তি অধর্মী হবে।

শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে আজও অশ্বত্থামা পৃথিবীতে ঘুরে বেড়াচ্ছেন। ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সনাতন ধর্মের পরম পুরুষ। হিন্দু ধর্ম অনুযায়ী তিনি বিষ্ণুর অষ্টম অবতার। তাঁকে সর্বোচ্চ দেবতা রূপে পুজো করা হয়। এর ওপর আর কোনো দেবতার স্থান নেই। ইনি শিষ্টের পালন এবং দুষ্টের দমন করেন। যুগে যুগে তিনি অবতার রূপে আসেন। ত্রেতা যুগের দেওয়া সেই অভিশাপ নিয়ে আজও অশ্বত্থামা জীবিত আছেন। মহাভারতের কুরু পাণ্ডবদের গুরুদেব দ্রোণাচার্য্যের পুত্র অশ্বত্থামাই অভিশপ্ত সেই ব্যক্তি। অশ্বত্থামা অত্যন্ত শক্তিশালী ছিলেন। স্বয়ং মহাদেব অশ্বত্থামাকে অমরত্ব বর প্রদান করেছিলেন। অশ্বত্থামার কপালে একটি রত্ন ছিল। সেই রত্নের বলে অশ্বত্থামার শক্তি ছিল আকাশ ছোঁয়া। শরীরে ক্ষুধা তৃষ্ণার বাধ্য এসব কিছুই তাঁর ছিলনা। তিনি ছিলেন চিরজীবি।

কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের অভিশাপে অশ্বত্থামার মর্মান্তিক পরিণতি হয়েছিল। এমন অভিশাপ শ্রীকৃষ্ণ তাঁকে দিয়েছেন, স্বর্গ-নরক কোথাও তাঁর শান্তি হবে না। মহাভারতের যুদ্ধে কোনো কারণেই গুরু দ্রোণাচার্য্যকে দমানো যাচ্ছিল না, পঞ্চপাণ্ডব, পরামর্শের জন্য শ্রীকৃষ্ণের কাছে যান। শ্রীকৃষ্ণ বলেন, দ্রোণাচার্য্যের কানে তাঁর পুত্র অশ্বত্থামার মৃত্যু সংবাদ পৌঁছে দিতে হবে। খুব চতুরভাবে পঞ্চপাণ্ডব যুদ্ধক্ষেত্রে একটি হাতির নাম দেন অশ্বত্থামা। এরপর ভীম সেই অশ্বত্থামা নামক হাতিটিকে বধ করেন। যুধিষ্ঠির গুরু দ্রোণাচার্য্যের উদ্দেশ্যে বলেন— "অশ্বত্থামা হত— ইতি গজ"। যুধিষ্ঠির 'ইতি গজ' শব্দটি খুব নীচু স্বরে উচ্চারণ করেন। তাই গুরুদ্রোণাচার্য্যের কানে শুধু দুটো শব্দই পৌঁছেছিল— 'অশ্বত্থামা হত'। দ্রোণাচার্য্য শুনে মনে করেছিলেন তাঁর প্রাণপ্রিয় পুত্র আর নেই। পুত্র শোকে তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়েন। এই সুযোগে পঞ্চপাণ্ডব দ্রোণাচার্য্যকে বধ করেন। পঞ্চপাণ্ডবদের এই কীর্তি শুনে অশ্বত্থামা ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন। আর তখনই অশ্বত্থামা প্রতিশোধ স্পৃহায় প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলেন। প্রতিশোধ নিতে অশ্বত্থামা, দৌপদীর

পরবর্তী অংশ ৪২ পৃষ্ঠায়ঃ

অবনীমোহনিয়া মোহনানন্দজী

শ্রীপিনাকী প্রসাদ ধর (পূর্বপ্রকাশিতের পর)

সাধনভজনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ দীর্ঘ, তীব্র কষ্ট সহিষ্ণুতা। একটি অবশ্যকরণীয় কুয়ো থেকে বালতি বালতি জল তুলে পাহাড়ি পথ বেয়ে ওপরে নিয়ে আসতেন নিজগুরুদেবের সেবা কার্য্যের জন্য। ছিন্ন কন্থা দরিদ্রের বেশ নিমাই বিহনে শচীমাতাতুল্য পাগলপারা মাতা বিনয়িনী দেবী ছুটে এলেন গুরুদেবের কাছে। সন্ন্যাসীকে তো আর ঘরে ফিরতে বলা যায়না— গুরুদেবকে শুধু বললেন; "বাবা বড় যত্নে যে মানুষ করেছি এইটুকু থেকে। ওর এই ভিখারির বেশ দেখে আমার বুকটা যে ফেটে যাচ্ছে," একটু হেসে বালানন্দজী বললেন, "মন খারাপ কোরোনা মায়ী। এতো শুরুর দিন। একদিন চেহারায় আর কাজে তোমার ছেলে হবে রাজ-রাজেশ্বর। নিশ্চিন্তে ঘরে ফিরে যাও।"

বজ্রাদপি কঠিন বাইরেটা, ভেতরটা কোনো মায়ের বুকের মতো নরম আর পথের দিশারী। অতুলনীয় এই গুরুর পথনির্দেশে অভিভাবকত্বে সুদীর্ঘ সতেরো বছরের সাধনায় তিনি হয়ে উঠলেন বালানন্দজীর সুযোগ্য উত্তরসূরী শিষ্য। মনমোহনের নির্মোক ভেদ ক'রে উৎসারিত হলেন আমাদের সবার ভক্তি-ভালো-বাসার পরম দেবরূপ মোহনানন্দজী। সতেরো বছর শ্রীগুরু সঙ্গ পেয়েছিলেন। তিরোভাব হলো বালানন্দজীর। মোহনানন্দজীর বয়স তখন চৌত্রিশ।

ওদিকে কী হলো মহাবিদ্যালয় বা কলেজের সমসাময়িকদের?

আরে! ট্রেনটা ছেড়ে দিলো যে! ধরতেই হবে... ধরতেই হবে গাড়িটা। নাহ'লে যে সব ওলোট-পালোট। চাকরির জন্য ইন্টারভিউতে পৌঁছানো যাবেনা, —আর এত ভালো চাকরি! পুরো সংসার যে তাকিয়ে রয়েছে তাঁরই দিকে— মা, ভাই-বোন সব্বাই। ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে দৌড়তে দৌড়তে একলাফে উঠে পড়লেন একটা কামরায়। প্রাণের ঝুঁকি? হ্যাঁ, তাতো ছিলই। ...হ্যাঁ, তবে চাকরিটা হলো। আই.সি.এস—উচ্চপদের কাজ।

ট্রেনের চাকার থেকেও দ্রুত ঘুরে চলে সময়ের চাকা, অবিরাম। সে চাকা শুধু ঘোরে না, কাটেও নিরন্তর। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ইতিহাসের পাতায় গেল কি গেলনা, হানা দিল দ্বিতীয় মহা বিশ্বযুদ্ধ। দেশ থেকে হঠাৎ উধাও, অন্তর্হিত সুভাষ চন্দ্র। খুব শিগগিরিই প্রচণ্ড লড়াই করে ব্রিটিশ সিংহের বুক কাঁপিয়ে দিলো আজাদ হিন্দ বাহিনী। বিশ্বযুদ্ধে সেই সিংহ তখন যথেষ্ট ঘায়েল। একা রামে রক্ষা নাই শুরু হলো নৌবিদ্রোহ। এলো গান্ধীর পরিচালনায় এক নতুন আন্দোলন।

'প্রচণ্ড গর্জনে আসিল একী দুর্দিন'.... রাজনৈতিক স্বাধীনতার চরম মূল্য দিতে হলো দেশ বিভাগের রক্তাক্ত অভিশাপে। '...মুক্তির সোপান তলে কতো প্রাণ হলো বলিদান,' কতো ঘর পুড়লো, সম্পদ হলো লুঠ, কতো নারী হারালো তাদের সবকিছু! ...উচ্চপদস্থ রাজকর্মচারী হয়েও অবনীমোহন আর

শিশির দত্তকে সহ্য করতে হলো এক অবিশ্বাস্য রাজনৈতিক অন্যায়। শুধু সহ্য করা নয়; অংশগ্রহণ করতে হলো এক চরম বুজরুকিতে। রাতারাতি বহিরাগতদের ঢুকিয়ে সিলেটের জন স্তর সম্পূর্ণ ওলোট-পালোট করে দিয়ে হলো জনমত নেবার এক দুঃখজনক প্রহসন। চোখের জলে তাঁরা নিজেদের জন্মভূমিকে বিদেশের হতে দেখলেন। বাপ-ঠাকুরদার ভিটে চলে গেল পাকিস্তানে। এক নিদারুণ প্রতারণা হারিয়ে গেল ইতিহাসের অন্ধকারে।

দেশ বিভাজনের গুমরে ওঠা দুঃখ বুকে চেপে রেখে নতুন করে কাজে মনোনিবেশ করলেন অবনীমোহন আর তাঁর সঙ্গীসাথীরা। আই.সি.এস পদ থেকে যাঁদের আই.এ.এস-এ নিয়ে আসা হল তাঁদের অন্যতম ছিলেন অবনীমোহন। সৌভাগ্যবশতঃ দেশ-বিভাগের সময় শিলং-ই ছিল তাঁর কর্মস্থল। বাসস্থান হারিয়ে একেবারে খালি হাতে যাঁরা চলে আসতে বাধ্য হয়েছিলেন এপারে, তাঁদের অনেকেই পৌঁছেছিলেন শিলং। এরকম অনেক দুঃখী মানুষেরই কর্মসংস্থান করে দিতে সমর্থ্য হয়েছিলেন অবনীমোহন। আত্মীয় পরিজন, একদা প্রজা, চেনাশোনা অনেক মানুষজনই তখন আশ্রয় নিয়েছিলেন শিলং-এ। নতুন দেশে, নতুন পরিবেশে আবার নতুন করে বাঁচার সম্বল খুঁজে চলেছেন মানুষ। ...খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে সময় এনে দিলো পঞ্চাশের দশক। পঞ্চ-বার্ষিকী পরিকল্পনা ইত্যাদি মিলে আশার দশক ছিল সেটি। প্রথম সাধারণ নির্বাচন ছিল দোরগোড়ায়। একটি ঘটনা, তাকে মহা উন্মীলন বা অতি ঘটনাই বলা চলে, ঘটলো ঠিক তখনই। বলি একটু তার কথা?

দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম....

'দেখেছো brother! Lure করবার ধরণটা দেখেছো একবার?'

'হ্যাঁ, যেন সংসারের কাজ কর্মে কোনো আনন্দই নেই; শুধু গুরুর নাম জপ ক'রে গেলেই পেট ভ'রে যাবে সবার! Most disgusting!'

আর দেখোনা পোষাকের বাহারখানা! রঙীন জোড় পরণে ইত্যাদি ইত্যাদি।

'ভবে সেই তো পরমানন্দ।

যেজন পরমানন্দময়ীরে জানে,'

'পরমানন্দ! বার করছি তোমার পরমানন্দ হওয়া!'

'কোন পরমানন্দময়ীর কথা বলা হচ্ছে?'

মীরাশী। সিলেটের একটি অভিজাত সম্পদসম্পন্ন পরিবারের জমিদারী সেখানে। বিভাজনের জোর ধাক্কা সামলাতে সামলাতে যতোটা সম্বল নিয়ে আসতে পারলেন এপারে, তাতেই চলে যাবে হয়তো আরো দু-এক প্রজন্ম। ওঁরা এসেছিলেন শিলং শৈলাবাসে আরো অনেক সদ্য গৃহহারার মতোই। আরবুথনট রোড শুরু হতেই ত্রিশূলের মতো ছড়িয়ে গেছে তিনটে রাস্তা বাঁদিকের একচিলতে পীচঢালা সমতল পথটি চলে গেছে ক্যাথলিক কবরস্থান আর অশ্রু নীড় বাড়ির দিকে। ডানদিকের বেশ বড় রাস্তাটার চোখ যেন নীচের দিকে। নীচে হুমড়ি খেয়ে নেমে যাবার আগে ডানদিকে নিজের একটা প্রশাখা যেন আকুল হ'য়ে ছুঁড়ে দিয়েছে সে ওপরের সঙ্গে সম্পর্ক বজায় রাখতে। আর রাখবে নাই বা কেন, —ওদিকটায় যে লাইটুমুখরা রামকৃষ্ণ মিশন আর মারবানিয়াং ধাম! ওদেরকে দুপাশে রেখে রাস্তা চলে গেছে কস্তুরি বাড়ি ছাড়িয়ে, থানা ঘুরে একেবারে কিনা বড় বাস রাস্তার দিকে। ওদিকে আরবুথনট রোড চললো

সোজাসুজি। এ'দিক ও'দিক না তাকিয়ে, চড়াই-উৎরাই সযত্নে এড়িয়ে সোজা চ'লে গেল 'আসাম রাইফেলস্' অধিষ্ঠানের দিকে। সেই অফিসে পৌঁছে যাবার একটু আগে, বাঁদিকে, প্রশস্ত চত্বরের একদিকে একটি দোতলা হরমৎ। এই বাড়িটিই নিজেদের বাসভবন করে নিলেন মীরাশী জমিদার-পরিবার। এঁদের সঙ্গে কোলকাতার আত্মীয়স্বজনদের যোগাযোগ যথেষ্ট নিবিড়। তাঁদেরই কারও কারও গুরুমহারাজ মোহনানন্দজী। মীরাশী পরিবারের অনেকেই কোলকাতায় আসতেন মাঝে মধ্যেই। ক্রমশঃ

---

৩৯ পৃষ্ঠার শেষাংশ

পাঁচ পুত্রকে একে একে বধ করেন। নিষ্পাপ পাঁচ পুত্রের প্রাণ যাওয়ায় ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অতি রুষ্ট হলেন। তিনি কিছুতেই অশ্বত্থামাকে ক্ষমা করলেন না। অশ্বত্থামাকে অভিশাপ দিয়ে বলেছিলেন, কোনোদিন অশ্বত্থামা মুক্তি পাবেন না—তাঁর মৃত্যু হবে না। এই পৃথিবীতেই কলিযুগের শেষ দিন পর্যন্ত তিনি জীবিত থাকবেন। পৃথিবীর সমস্ত জ্বালা যন্ত্রণায় ভুগতে ভুগতে জর্জরিত হতে থাকবেন। মানুষের দ্বারে দ্বারে ঘুরে মাথা ঠুকে প্রায়শ্চিত্ত ভোগ করবেন। মধ্যপ্রদেশের গুরুহান পুরে এক গুহায় সাতপুরা পাহাড়ের চূড়ায় এক দুর্গে তিনি বসবাস করেন। সেখানে শিবমূর্তি রয়েছে। প্রতিদিন প্রাতঃকালে ফুল বেলপাতা দিয়ে কেউ পুজো করে যায়। স্থানীয় লোকেরা মনে করেন, এত সকালে কে যায় ঐ মন্দিরে? পুজো করেন মহাদেবকে? তাদের ধারণা অশ্বত্থামাই পুজো করে যান।

চৈতন্য চরিতামৃতে দেখা যায়— শ্রীকৃষ্ণকে অন্ন নিবেদন করলে তা হয় ভোগ আর সেই ভোগ গ্রহণ করলে তাকে বলা হয় প্রসাদ। চার ধাম— ভারতের দক্ষিণে অবস্থিত রামেরশ্বর ধামে শ্রীকৃষ্ণ স্নান করেন, উত্তরে বদ্রীনাথ ধামে তিনি ধ্যান করেন, পশ্চিমে অবস্থিত দ্বারকায় শয়ণ করেন। যেহেতু ভগবান এই পুরীধামে নিত্য আহার গ্রহণ করেন, তাই পুরীধামের ভোগের মাহাত্ম্য অসীম। জগন্নাথ ধামে যে ছাপ্পান্ন রকমের ভোগ রান্না করা হয়, তা যেন স্বয়ং মা লক্ষ্মী রান্না করেন। আশ্চর্যের বিষয় হল— রান্নার পর ভোগ থেকে কোনো সুগন্ধ আসেনা, ভোগ নিবেদনের পরে, প্রসাদ হবার পরে খাবার থেকে স্বাদ ও সুবাস আসতে থাকে। এই ভোগ-রন্ধন প্রণালী চার প্রকার হয়— ভীমপাক, নল পাক, গৌরী পাক, সৌরী পাক। শ্রীশ্রীগুরুচরণে জানাই অনন্তকোটি প্রণাম।

জয় শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীকী জয়।

অমৃতবাণী

শ্রীভগবান আমাদের অনুরাগ দিয়েই পাঠিয়েছেন, কিন্তু আমরা সে অনুরাগ শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ না করে আপাত রমণীয় অনিত্য বস্তুতে অর্পণ করে অনুরাগের অপব্যবহার করছি।

শ্রীশ্রীবালানন্দের ঈশ্বরী শ্রীশ্রীবালেশ্বরী

ভক্তের অনুভূতিতে-প্রথম পর্ব

শ্রীসোমনাথ সরকার

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজীকে প্রণাম জানিয়ে, শ্রীশ্রীবড়গুরুমহারাজজীকে প্রণাম জানিয়ে এবং শ্রীশ্রীবালেশ্বরী দেবীমাকে প্রণাম জানিয়ে এই লেখা শুরু করছি।

আমাদের শ্রীশ্রীবালানন্দ (রামনিবাস) ব্রহ্মচর্য্যাশ্রম, করণীবাদ, বৈদ্যনাথ ধাম দেওঘর থেকে প্রকাশিত "শ্রীশ্রীগুরুগীতা ও স্তোত্রমালা" বইটিতে যে "শ্রীশ্রীবালেশ্বর্য্যষ্টকং স্তোত্রম্" আছে, সেই স্তোত্রটি প্রতিদিন দেবী মন্দিরে সন্ধ্যারতির পর দেবীমায়ের সম্মুখে পাঠকরা হয়।

স্তোত্রটি পাঠ করার সময় আমরা একটা কথা পাচ্ছি, "অষ্টক"। প্রথমে এই "অষ্টক" কী একটু বুঝে নেওয়া যাক। সাধারণতঃ গদ্যে আমরা যাকে "বাক্য" বলি কবিতায় তাই-ই "চরণ"। অর্থগত দিক থেকে "পূর্ণচ্ছেদ" বাক্যকে "ছন্দ যতি"র দিক থেকে "চরণ" বলা হয়।

দেবদেবীর প্রশস্তি বা স্তুতি সূচক আট স্তবক (Stanza) ওলা যে ছোট স্তোত্র কবিতা হয় সেগুলিকে "অষ্টক" বলে।

আমরা যারা শ্রীহনুমান চালিসা পাঠ করি, তাতেই গোস্বামী তুলসিদাস বিরচিত "সংকট-মোচন হনুমানাষ্টক" দেখতে পাই। এছাড়াও শ্রীশ্রীআদিশঙ্করাচার্য্য বিরচিত বেশ কিছু অষ্টকম্ স্তোত্র আমরা দেখতে পাই।

শ্রীশ্রীমায়ের ধ্যানে আমরা দেখতে পাই "ওঁ রক্তাম্বরাং চন্দ্রকলাবতংসাং"— হে দেবীমা, আপনি রক্তের মত লাল রঙের (অম্বর) বস্ত্র পরিহিতা। আপনার মস্তকের মুকুট চন্দ্রকলার শোভাযুক্ত।

মার্কণ্ডেয় পুরাণ অন্তর্গত শ্রীশ্রীচণ্ডীতে আমরা দেবী চণ্ডীকার ধ্যান-এ দেখতে পাই—

"স্ফুরৎ-চন্দ্র-কলা-রত্ন মুকুটাং"

উদীয়মান চন্দ্রকলা যাঁহার মুকুটে রত্নরূপে বিরাজিতা।

"সমুদ্যতাদিত্যনিভাং ত্রিনেত্রাম্"। সম উদ্যত আদিত্য নিভাং-উদীয়মান সূর্য্যের ন্যায় লাল গাত্রবর্ণ দেবীর। দেবী ত্রিনয়না।

"বিদ্যাক্ষমালা ভয়দানহস্তাং"

দেবীর চারি হস্তে বিদ্যা (অর্থাৎ বেদ পুস্তক), অক্ষমালা, বরমুদ্রা ও অভয়মুদ্রা।

দেবী বাম অধঃ হস্তে বেদপুস্তক ধারণ করে রয়েছেন। আমরা শ্রীশ্রীচণ্ডীগ্রন্থের প্রথমেই শ্রীশ্রীচণ্ডীর ধ্যান অংশে দেখতে পাই—

"ত্রিনেত্রাং রক্তবসনাং পীনোন্নতঘটস্তনীং..." ইত্যাদি, যার অর্থ আম্নায়-মানিতাম্। দেবী আগম শাস্ত্রের প্রতিপাদ্যা। সকল বিদ্যা তাঁর থেকেই নির্গত হয়েছে।

আবার ঐ গ্রন্থের প্রথম অধ্যায়ে মধুকৈটভ বধ অংশে দেখি, "সা বিদ্যা পরমা মুক্তের্হেতুভূতা সনাতনী"। তিনি (সংসার) মুক্তি হেতু পরমা ব্রহ্মবিদ্যা-রূপিনী সনাতনি যেহেতু তার পরেই আমরা দেখছি ব্রহ্মা তাঁর স্তবে দেবীকে বলছেন "মহাবিদ্যা, মহামায়া, মহামেধা মহাস্মৃতিঃ"। এখানে পরোক্ষভাবে দেবীর একটা রূপ আমরা দেখলাম। দেবীর সরস্বতী (মহাবিদ্যা) রূপ। মনে হয় সেই জন্যই কিন্তু দেওঘর আশ্রমে শ্রীশ্রীবালেশ্বরী মায়ের প্রতিষ্ঠা তিথি ঐ দিন।

"ধ্যায়ামি বালাকরুণাম্বুজস্থাম্"

অম্বুজ-অম্বু অর্থাৎ জল। জলে জন্মায় যা অর্থাৎ পদ্ম। আবার অম্বুজা মানে দেবী লক্ষ্মী অর্থাৎ পদ্মিনী। তিনিও জল থেকেই উত্থিতা (সমুদ্র)। আবার লক্ষ্য করার বিষয় প্রতি বৃহস্পতিবারে আরতির পর দেবীমায়ের কাছে, "শ্রীসূক্তম" পাঠ করে মাতৃপদে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া হয়। তাহলে দেবী মায়ের দ্বিতীয় রূপ অর্থাৎ "মা লক্ষ্মীর" রূপটাও আমরা দেখে নিলাম। পদ্মের উপরে আসীন সেই করুণাময়ী বালিকা রূপিনী দেবী শ্রীশ্রীবালেশ্বরীকে আমি ধ্যান করি।

"আধারশক্ত্যাহিত— কূর্ম্মপীঠে"— আধারশক্তি আহিত কূর্ম্মপীঠে।

আধার শব্দটার সাধারণ মানে হচ্ছে স্থান বা পাত্র; যাহার উপরে বা ভিতরে কিছু রাখা হয়। আহিত বলতে বোঝায় স্থাপিত।

এখানে আধারটি হল কূর্ম্ম। আমাদের হিন্দুধর্মে কূর্ম্মর একটি বিরাট ভূমিকা আছে।

আমরা জানি ভগবান শ্রীবিষ্ণু দ্বিতীয় অবতারে কূর্ম্মরূপ ধারণ করেছিলেন। শ্রীমদ্ভাগবতম্ এর অষ্টম স্কন্ধ ষষ্ঠ ও সপ্তম অধ্যায়ে আমরা দেখতে পাই দেব ও দানবগণ কর্তৃক সমুদ্র মন্থনের সময় মন্দার পর্বতকে মন্থনদণ্ড এবং বাসুকি নাগকে মন্থন রজ্জু হিসাবে ব্যবহার করা হয়। সমুদ্র মথিত হতে শুরু হলে ঐ মন্দার পর্বত আধারশূন্য অবস্থায় থাকায় অতি গুরুভার বশতঃ বলবান দেব ও দানবগন কর্তৃক ধৃত হয়েও সমুদ্রের জলে নিমজ্জিত হতে থাকলে তা দর্শন করে করুণাময় ভগবান শ্রীবিষ্ণু লক্ষযোঁজন বিস্তৃত অতি বিশাল এক কূর্ম্মরূপ ধারণ করে জলমধ্যে প্রবেশ করে আধারশূন্য মন্দার পর্বতকে পৃষ্ঠের উপরে তুলে ধরলেন। এইভাবে পর্বত উত্থিত হলে পুনরায় নতুন উদ্যমে সমুদ্রমন্থন কার্য আরম্ভ হল।

শ্রীশ্রী জয়দেব কৃত দশাবতার স্তোত্রম্ এ আমরা দেখতে পাই দ্বিতীয় শ্লোকে—

"ক্ষিতিরতি বিপুল তরে তব তিষ্ঠতি পৃষ্ঠে, ধরণি ধরণকিণ চক্রগরিষ্ঠে।
কেশব ধৃত কচ্ছপ রূপ, —জয় জগদীশ হরে।।"

ক্ষিতিঃ —পৃথিবী, অতি বিপুল তরে —অতি বিশাল; তব পৃষ্ঠে তিষ্ঠতি। তোমার পিঠে অবস্থান করে।

"কিণ" কথাটার মানে হচ্ছে "কড়া পড়ে যাওয়া।" কোনও কিছু ক্রমাগত ঘর্ষণের ফলে যখন জায়গাটা শক্ত হয়ে যায়।

ধরণি-পৃথিবী, ধরণ-ধারণ করে, কিণ-কড়া চক্রগরিষ্ঠ (কচ্ছপ রূপ ধারণ করে শ্রীজগদীশ শ্রীবিষ্ণু যখন পৃষ্ঠে পৃথিবীকে ধারণ করেছিলেন এবং মন্দার পর্বত মন্থন দণ্ড হিসাবে তাঁর পৃষ্ঠে ঘোরানো হয়েছিল তখন ঘর্ষণের ফলে সেই কচ্ছপের পৃষ্ঠে গোল চাকা চাকা দাগ হয়ে গিয়েছিল, যেটাকে কড়া পড়ে যাওয়ার মত দেখতে)।

এইভাবে আমরা দেখলাম সৃষ্টির আদিযুগে সর্বপ্রথম স্বয়ং শ্রীভগবান বিষ্ণু আধার হিসাবে কূর্মরূপ ধারণ করেছিলেন। অতএব আধার হিসাবে কূর্ম আমাদের কাছে অতি পবিত্র। আমরা যারা দীক্ষিত এবং

ত্রিসন্ধ্যা করি, অথবা পুরোহিত, যাঁরা পুজো করেন তাঁরা আসনে বসে আসনশুদ্ধির মন্ত্র বলেন।

"এতে গন্ধপুষ্পে ওঁ হ্রীং আধারশক্তয়ে কমলাসনায়/কম্বলাসনায় নমঃ।" এখানে যে আসনে বসে পুজো করা হচ্ছে সর্বপ্রথম তাকে আধার শক্তি হিসাবে মন্ত্রশুদ্ধি করে নেওয়া হচ্ছে।

"ওঁ অস্যাসন মন্ত্রস্য মেরুপৃষ্ঠ ঋষিঃ সুতলং ছন্দ কূর্মোদেবতা আসনোপবেশনে বিনিয়োগঃ"

এই মন্ত্রের ঋষি মেরুপৃষ্ঠ, ছন্দ সুতল, দেবতা কূর্ম। তাহলে এখানে আসনের আধার শক্তি রূপে কূর্ম অবস্থিত।

"ওঁ পৃথ্বিত্বয়া ধৃতা লোকা দেবি ত্বং বিষ্ণুণা ধৃতা।
ত্বঞ্চ ধারয় মাং নিত্যং পবিত্রং কুরু চাসনম্।।"

হে মাতঃ পৃথিবী, আপনি লোক সমূহ ধারণ করে আছেন। আপনি আবার (কূর্মরূপী) বিষ্ণুর দ্বারা ধৃতা। আপনি আমাকে নিত্যধারণ করুন এবং এই আসন পবিত্র করুন।

পীঠ সাধারণ অর্থে বসার আসন। দেবমূর্তির অবস্থান সূচক বেদী। পীঠ বলতে ভগবানের মূর্তি প্রতিষ্ঠার যে বেদী বোঝায়, দেব ও দেবী ভেদে তার প্রকার ভেদ হতে পারে।

পীঠ বলতে আবার সাধু মহাত্মাদের সাধনপীঠ বা সাধনস্থলও বোঝায়। আমাদের ধর্মে পীঠ এতটাই গুরুত্বপূর্ণ যে দেবতার আসন হিসাবে পীঠ দেবতাই হয়ে উঠেছে। "এখানে যেমন কূর্ম পীঠ। যাঁর উপরে দেবী বালেশ্বরী মায়ের অবস্থান—"

যাঁরা ত্রিপুরা রাজ্যে দেবী ত্রিপুরেশ্বরীকে দর্শন করেছেন, তাঁরা জানেন, এই মন্দিরের প্রাঙ্গনটি অবিকল কূর্মের মত হওয়ায় একে কূর্মপীঠও বলা হয়।

হিন্দু ধর্ম অনুসারে শ্রীবিষ্ণুর চক্রে দেবী সতীর দেহের খণ্ডিত অংশগুলি যে একান্নটি স্থানে পড়েছিল তাকে মহাপীঠ বা শক্তিপীঠ বলা হয়।

দেবী ত্রিপুরেশ্বরী একান্নশক্তিপীঠের একপীঠ। অতএব এখানে কূর্মপীঠকে আধার শক্তি হিসাবে ধরে তার উপরে দেবীর অবস্থান (আহিত-স্থাপিত)।

"যন্ত্রে ত্রিপঞ্চার-সমহ্বয়ে যা"—যন্ত্র বলতে এখানে শ্রীযন্ত্র বোঝানো হয়েছে।

ত্রিপঞ্চার-ত্রি-পঞ্চ-অর (পঞ্চদশ কোণযুক্ত শ্রী যন্ত্র)। একদম মধ্যে বিন্দু (অর্থাৎ শিব-শক্তি ব্রহ্মবীজ) উহার পরে বহিঃ ষটকোণ ও অন্তঃ ত্রিকোণ।

"পঞ্চদশ অর বা কোণ।"

"পদ্মাসনস্যোপরি সন্নিষণ্ণা।
দেবী পদ্মের আসনের উপর উত্তমরূপে
আসীনা। বসে আছেন।

"বালেশ্বরীং তামহমনতোহস্মি।"
তাম্ অহম্ আনত অস্মি"
সেই দেবী বালেশ্বরীকে আমি মাথা নত করে প্রণতি জানাই।।

জপ-ধ্যান

শ্রীমতী অনসূয়া ভৌমিক

এবারের লেখাটা কি বিষয়ে লিখবো তাই নিয়ে মনে মনে নিজের সঙ্গেই আলোচনা করছি, এই লেখাটাতো আবার গুরুপূর্ণিমার সময় বেরোবে, কি লিখি কি লিখি হঠাৎ মনে হোল জপ ধ্যান নিয়েলিখলে কেমন হয়! কিন্তু এই বিষয় নিয়ে লেখার কি যোগ্যতা আমার আছে, সেটাও তো ভাবতে হবে। ভাবতে ভাবতে মনে হল আমার কাছে তো মহারাজজীর সম্বন্ধে বা তাঁর বাণী সম্বলিত অনেক বই আছে, তাই খুঁজে দেখিনা কেন। খুঁজতে খুঁজতেই প্রার্থিত বস্তু পেয়ে গেলাম, এখন মহারাজের বাণী ও রচনা থেকে কিছু মণি মুক্তো আপনাদের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছি।

প্রথমেই আসি জপের কথায়। আমরা যারা দীক্ষা নিয়েছি, নিত্য জপ আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য, ঠাকুরের কাছে আসনে বসে গুরুর কাছে পাওয়া বীজমন্ত্র বা ইষ্ট দেবদেবীর নাম কমপক্ষে ১০৮ বার, আর তারপর যে যত পার জপ করবে। এছাড়াও ঘুরতে ফিরতে আমরা মনে মনে জপ করতেই পারি, এজন্য বলা হয়েছে "মুখে নাম হাতে কাম",। একাগ্রমনে জপ করতে করতে একসময় সিদ্ধিলাভও হয়।

তাই বলা হয়েছে, "জপাৎ সিদ্ধি"।

গুরুমহারাজজীর গানের ভেতর দিয়ে অনেকভাবেই জপের কথা বলা হয়েছে, তার একটি—

"দিন তোমার আনন্দে যাবে জপলে গুরুর নাম জপ জপ গুরুর নাম জপ গুরুর নাম—

আবার আরেক জায়গায় দেখি—

"শ্বাসে শ্বাসে জপ নাম হরে রাম হরে রাম-এর অর্থ হল নিরন্তর জপ বা স্মরণ করার অভ্যাস করার উপদেশ— মন যাতে একাগ্র হতে পারে সেই রকম স্মরণাভ্যাস করা। বাচনিক ও মানসিক দু ভাবেই জপ অভ্যাস করা যায়, উচ্চস্বরে কীর্তনও বাচনিক জপের মধ্যে পড়ে। মানসিক জপে নাম মাত্র স্মরণ বোঝায়। বহু অক্ষরের ও ছন্দের মন্ত্র জপ বা স্মরণ করা কঠিন। যবন হরিদাস শ্রীমহাপ্রভুর দ্বারা আদিষ্ট হয়ে রোজ তিনলক্ষ নাম জপ করতেন। এই তিনলক্ষ নামজপ একাক্ষরী বা দ্ব্যক্ষরী হলেই সম্ভব, না হলে নয়। বৃহৎ মন্ত্র বিরামহীনভাবে জপ করলেও সত্যই তিনলক্ষ জপ করা কঠিন। আসনে বসে ঠাকুরের সামনে জপ করতে পারলে খুবই ভাল, কিন্তু অবস্থা বিশেষ গুরুমহারাজজী বিধান দিয়েছেন, "শারীরিক অসুবিধা অশুচি, জাতাশৌচ, মৃতাশৌচ, ব্যাধিক্লিষ্ট শরীর থাকলে মালা জপ না করে কর জপেই জপ কাজ হতে পারে, তাতে কোন ক্ষতি হয় না।"

ধ্যান—

জপ করতে করতে মন শান্ত হয়ে এলেই ধ্যানের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ধ্যান করতে হলে শান্ত পরিবেশ প্রয়োজন, নিজেরমন শান্ত হলে তবেই তো আরাধ্য দেবতা, ইষ্ট দেবী বা গুরুদেবের ধ্যান করতে পারি।

হৃৎ কমলে তাঁর আবির্ভাব হয়েছে ভেবে নিয়ে তাঁকে একান্তভাবে ডাকি।

শ্রীশ্রীগুরুমহারাজজী নানাভাবে এই ধ্যানের কথা বলেছেন, তারই কিছুটা এখানে লেখার চেষ্টা করছি, উনি বলছেন, জপের সঙ্গে ধ্যান অভ্যাস করতে হয়। ছবি নিয়ে mental কোন image নিয়ে কোন একটা symbol নিয়ে, মনটা একটা জায়গায় স্থির হয় তার জন্য। জপ পুরশ্চরণ ইত্যাদি যা কিছু এ সমস্তই হল মনটাকে স্থির করার জন্য। মন স্থির হয়ে গেলেই "অভ্যাসেন বৈরাগ্যেন একটা হল Positive আরেকটি Negative. Positive হল ঐ জপ ধ্যান ইত্যাদি করা আর Positive হল বিষয় চিন্তা না করা। বিষয়ের প্রতি বৈরাগ্য আর ভগবানের প্রতি অনুরাগ। অনুরাগ আর বিরাগ এই দুটোকে completely একসঙ্গে করতে পারলেই আমাদের সাধনা সার্থক।

আরেক জায়গায় গুরু মহারাজজী বলছেন— ধ্যান তো নিরাবলম্বের একটা শূন্যের হয় না। দেখ, যাঁরা মূর্তি মানেন না, তাঁদেরও একটা symbol প্রয়োজন। মক্কাতে গিয়ে দেখ, ওখানে যে আছেন একটা প্রদীপ জ্বালায়, ও একটা symbol আবার চার্চে গিয়ে দেখ, cross দেখলেই hat নামায়। vacant কোন জিনিসে আমরা concentrate করতে পারিনা। Formless কোনো জিনিসে আমাদের মন বসে না। আমরা চাই some form informing something– যে কোন জিনিসে যথাভিমত ধ্যানারম্ভ। ধ্যানের কোন বিশেষ বস্তু নির্দেশ দেননি। আমার মনে যে দেবতা সবচেয়ে বেশী ভালো লাগে, তাঁরই ওপর ধ্যান করলে আমার মন শীঘ্রই স্থির হবে। যে বস্তুটা আমার ভেতর একটা thrill নিয়ে আসে অনুরাগ নিয়ে আসে, একটা আনন্দ নিয়ে আসে সেই জিনিসটার যদি আমরা ধ্যান করি, তা হলে মন সেখানে অভিনিবিষ্ট হবে। 'ধ্যানমূলং গুরোর্মূর্ত্তিঃ কিন্তু গুরুর ধ্যান মানে তাঁরা নাক মুখ চোখ, তাঁর চেহারা তাঁর রূপগুণ এ সবের ধ্যান নয়। গুরুর মধ্যে যে অখণ্ড চৈতন্যসত্তা আছে, তাই ধ্যানের বিষয়বস্তু করা তাকেই বোধে বোধ করা। গুরু, ইষ্ট, মন্ত্র একই কেন্দ্রের ত্রিবিধ অভিব্যক্তি, সবই চৈতন্যময়— এই ভাবনা করে গুরু মন্ত্র, ইষ্টকে ধ্যান করতে পারা যায়।

গুরু মহারাজজী বলছেন ধ্যান হোল অভ্যাস যোগ, অর্থাৎ অভ্যাস করতে করেতেই ধ্যান হবে। এবার প্রশ্ন হল দেহের কোথায় মন নিবিষ্ট করে ধ্যান করতে হবে? এতে তিনি বলছেন, যার যা সুবিধা, হৃদয়ে করলে সুবিধা। ভ্রূ মধ্যে করলে একটা tension of eyes হয়। হৃদয়, ভ্রূ মধ্য, নাসিকাগ্রভাগ-tip of nose এই তিনটে ধ্যানের জায়গা। যার পক্ষে যেটা সহজ সে সেখানেই ধ্যান করবে, আবার শিরস্থান ও ধ্যানের জায়গা, হৃদয়ে করলে চোখ বুজে আমরা ধ্যান করতে পারি। নাসিকাগ্রে করলে একটা কল্পনার সাহায্যে মনটাকে সেখানে নিয়ে যেতে হয়, কিন্তু হৃদয়ে করলে সুবিধা কারণ আমাদের ভাব ভালবাসা এ সবের আধার হল হৃদয়। Heart থেকে আমাদের সমস্ত ideas এর formation হয়, যদিও brain এখানে contribute করছে, তবে কোন বাঁধাধরা নিয়ম নেই। অনেকে আছেন যারা ভ্রূমধ্যে ধ্যান করেন, অনেকে চোখ বুজেই সহস্রাধিক ধ্যান করেন, অনেকে নাসিকাগ্রে ধ্যান করেন, অনেকে আবার বাইরের কোন symbol রেখে সেখানেই কেবল ধ্যান করেন।

'তদ্ জপো তদর্থরোবনং যথাভিমত ধ্যানম্'

এতো হল আমাদের গুরু মহারাজজীর কথা এবার রামকৃষ্ণ মিশনের ঈশাত্মানন্দজী এ বিষয়ে যা বলেছেন তা আমরা পরবর্তী লেখায় আলোচনা করব।

ক্রমশঃ

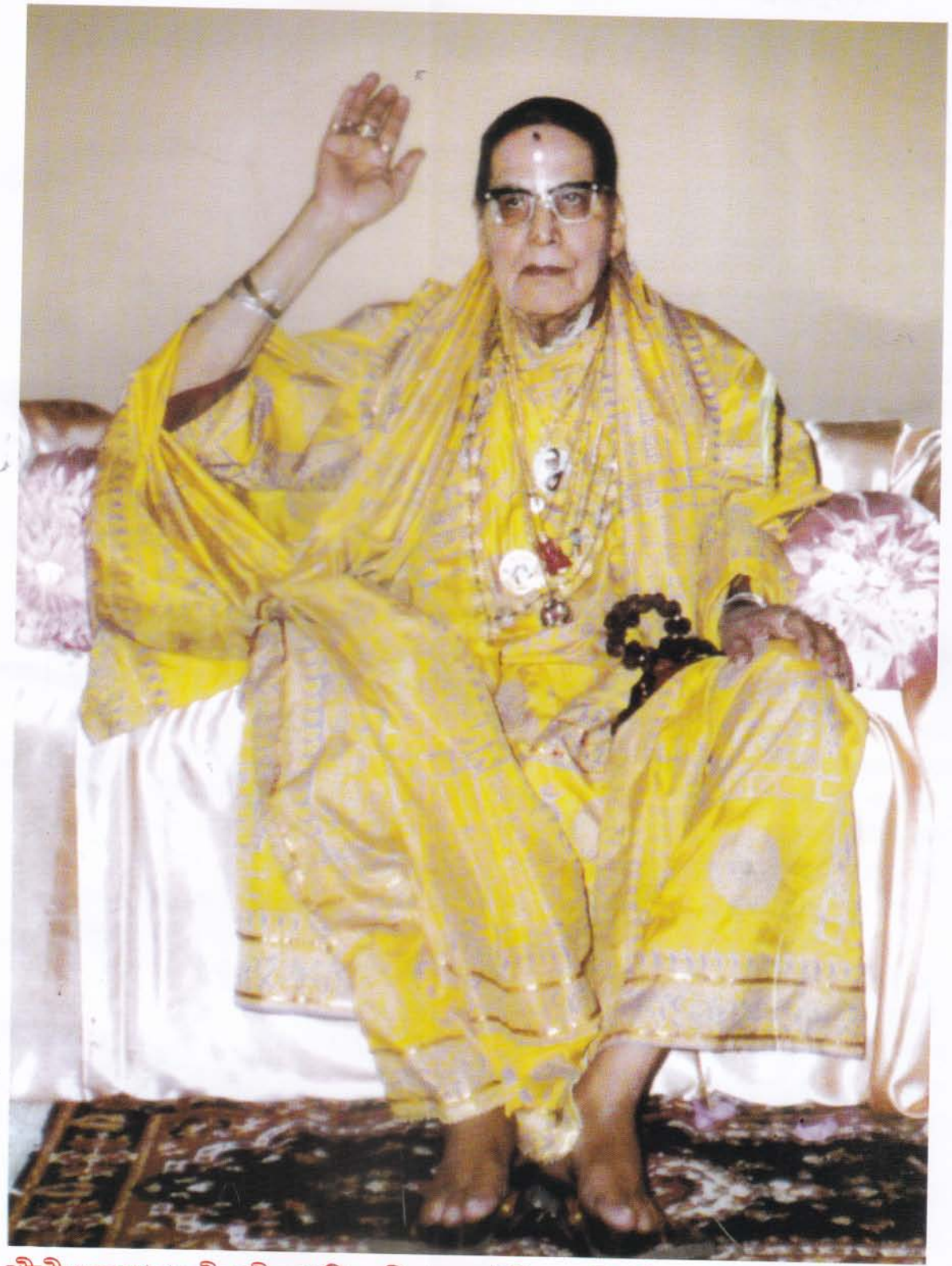

শ্রীশ্রী গুরুমহারাজজীর শ্রীচরণাশ্রিত শ্রী শঙ্কর ভৌমিক ও শ্রীমতী রুণা ভৌমিকের সৌজন্যে

পুণ্য-পরশ-পুলক (১৯শ পর্ব)

শ্রীবসুমিত্র মজুমদার

গুরু মহারাজ ধানবাদে এলে আমাদের ওপর অনেক দায়িত্ব থাকতো। ভোর বেলা চারটে সাড়ে চারটে নাগাদ উঠে তাঁর জন্যে খাটাল থেকে দুধ আনা থেকে শুরু করে রাতে কীর্তন শেষে তাঁর দিনান্তের অবসর- হয়তো রাত আড়াইটে কী তিনটে- পর্যন্ত আমাদের কাজ থাকতো। রাতের বেলা কাজ শেষ করে শুতে যেতাম। আবার পরের দিন ভোর বেলা থেকে উঠে কাজ শুরু হতো। কিন্তু কোনও পরিশ্রমই গায়ে লাগতো না। ঠিক মতো খাওয়াদাওয়া নেই, ঘুম নেই এমনকি আবশ্যিক বর্জন পর্বও ঠিক মতো করার সময় পেতাম না। কিন্তু তাতেও ক্লান্তি বা শরীর অবসন্ন হওয়ার কোনও লক্ষণই থাকতো না। উল্টে বিপুল উৎসাহে হৈ হৈ করে কাজে মেতে থাকতাম। তিন দিন ধরে এই পরিশ্রমের পর গুরুমহারাজ যখন চলে যেতেন তখন আর কিছুই ভাল লাগতো না। ওই 'শূন্য ভেল মন্দির, শূন্য ভেল সগরি' অবস্থা হত। খাওয়ার ইচ্ছে নেই, কথা বলার ইচ্ছে নেই, একা থাকতেও ভাল লাগতো না, আবার সবার মাঝে থাকতেও ভাল লাগতো না। সে এক অদ্ভুত শূন্যতা অনুভব করতাম। আর ওই তিন দিন যে কী ভাবে কোথা দিয়ে কেটে যেত বুঝতেও পারতাম না।

দুপুর বেলা কীর্তন শেষ করে গুরুমহারাজ ঘরে যেতেন। ঘন্টা খানেক পরেই আবার বেড়াতে যাবার আয়োজন। বেড়াতে যাবার আগে তিনি ফটো তুলতেন। আমরা সবাই ছোটোরা সামনে বসে যেতাম। গুরুমহারাজের জন্যে কখনো চেয়ার থাকতো, কখনো তিনিও আমাদের সঙ্গে দাঁড়িয়েই ছবি তুলতেন। ক্যামেরায় আমাদের সবাইকে দেখে নিয়ে শাটার টিপে মহারাজ আমাদের কাছে নির্দিষ্ট জায়গায় এসে দাঁড়াতেন। ছবি তোলা হয়ে গেলে অবাক হয়ে দেখতাম; ক্যামেরা থেকে একটা কাগজের প্যাকেটের মতো বার করে হাতে নিয়ে খানিকক্ষণ নাড়াতেন, যেন ওটাতে হাওয়া লাগাচ্ছেন। তারপর প্রিন্টেড ফটো হাতে নিয়ে নিজে দেখতেন, সবাইকে দেখাতেন। আমরা সামনে গেলে ছবির মধ্যে হাত দিয়ে দেখিয়ে বলতেন, 'এই তো তুমি! এই তো তুমি! তারপর ফটো পর্ব শেষ করে আমরাও তাঁর সঙ্গে বেড়াতে যেতাম।

যাঁর হোক তাঁর গাড়িতে চড়ে যেতাম। কখনও কখনও গুরুমহারাজ যে গাড়িতে যাচ্ছেন সে গাড়িতেও আমাদের স্থান হতো। তার অবশ্য কারণ ছিল এই যে, আমাদের মধ্যে কেউ কেউ গান গাইতে পারতো। একবার তো চলতে চলতে গান খুঁজে না পেয়ে আমি সামনের সীটে বসা গুরুমহারাজকে জিজ্ঞেস করলাম, 'আমি একটা কবিতা বলবো? মহারাজ মাথা নাড়িয়ে সম্মতি দিলেন। শুরু করলাম, 'উদ্‌ভ্রান্ত সেই আদিম যুগে...।' ফেরার পর আমার সঙ্গী সাথীরা আমাকে খুব বকলো। 'তোর কোনও কাণ্ডজ্ঞান নেই! মহারাজের সামনে ওই কবিতা কেউ বলে! কেন কী হয়েছে?

—মনে করে দ্যাখ, 'দস্যু পায়ের কাঁটামারা জুতোর তলায়' এই সব কথাগুলো কী কেউ মহারাজের সামনে বলে!

শুনে আমার মন খারাপ হয়ে গেল। তাই তো মহারাজ কী ভাবলেন? ছি ছি!

একবার ও রকম বেড়াতে গেছি, কার একটা বাড়িতে পৌঁছে গেছি, কিন্তু বাকিরা তখনও এসে পৌঁছতে পারে নি। এদিকে সেখানে গুরুপ্রণাম শুরু হয়ে গেছে। মহারাজ হঠাৎ আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, 'গান কর।' আমি তো অবাক! আমি গান গাইবো কী! আমি তো কবিতা বলি, তবলা বাজাই। কিন্তু মহারাজের আদেশ। গান শুরু করলাম- 'কোথায় ফিরিস পরম শেষের অন্বেষণে/অশেষ হয়ে সেই তো আছে এই ভুবনে...।' যতই গাইছি ততই অবাক হচ্ছি- এ কী আমার গলা দিয়ে সুর বেরোচ্ছে! বাড়িতে যতবার কোন গান গাইতে ইচ্ছে করেছি, ততবার শুনেছি 'আমার হেঁড়ে গলা এ গলায় গান হবে না। কিন্তু আজ সুর বেরোচ্ছে! এ কী করে সম্ভব!

সেবার রাতের বেলা কাছাকাছি কোনো একটা বাড়িতে কীর্তন ছিল। সেখান থেকে আমরা হেঁটেই বাড়ি ফিরছি। রাস্তায় হাইড্রেন তৈরি করার জন্যে রাস্তা কিছুটা খারাপ ছিল। আমরা সকলে সাবধানেই পা ফেলে চলছিলাম। এমন সময় হঠাৎ আমার বোন হুমড়ি খেয়ে সেই ভাঙা রাস্তায় পড়ে গেল। হাঁটু, কনুই ছড়ে গেল, ও ছোটবেলা থেকেই খুব ভুগতো। বছরে বার দুয়েক হাসপাতালে যেতেই হতো। গুরুমহারাজের কাছে দীক্ষা নেবার পর থেকে সেই অসুস্থতা চলে গিয়েছিল। কিন্তু ওই রকম পড়ে গেলে ডাক্তার বদ্যি করে বেশ কিছু ভোগান্তি বাবা মাকে ভুগতে হতো। এবারে ও পড়ে যেতেই আমাদের মন খারাপ হয়ে গেল। বাড়ি গিয়ে বকুনি খেতে হবে। কেন ওই রাস্তায় গেলাম..... ইত্যাদি। এবং যথারীতি বাড়িতে ফেরার পর ওকে নিয়ে বাবা মা উৎকণ্ঠায় রইলেন। নিজের বাড়ি হলে চেনা ডাক্তার আছে। কিন্তু বিদেশ বিভুঁই-এ কোন্ ডাক্তারকে ডাকবেন? তার ওপর গুরুমহারাজজী বাড়িতে রয়েছেন, এই সময় তো মাসী মেসোমশাইকে বিরক্ত করাটাও ঠিক হবে না।

রাতে শয়ন-লীলার আগে গুরুমহারাজ দরজা খুললেন। ওই সময় কিছু উপদেশাদি দিতেন, গুরুশিষ্যের সম্পর্কের কথা বলতেন। রসিকতা করতেন। আমাদের সবার হাতে একটু একটু করে মশলাও দিতেন। একবার হাতে হাতে আদা শুট দিতে দিতে বলেছিলেন, 'আদা খায় গাধারা।'

যাইহোক গুরুমহারাজ দরজা খোলার পর ছোটোমাসী বোনকে মহারাজের কাছে এনে বললেন, 'এই যে বাবা, রাস্তায় পড়ে এ হাত পা কেটেছে। এর অনেক কৃতিত্ব একবার কাটা ছেঁড়া হলেই পনেরো দিন ডাক্তার বাড়ি করতে হয়।' গুরুমহারাজ একবার চোখ তুলে তাকালেন। 'কোথায় কেটেছে?' বোন তার হাঁটু কনুই দেখালো। মহারাজ বললেন, 'ও কিছু হবে না।' ওমা কী আশ্চর্য ওর কিছুই হল না। পরের দিন যেমন হৈচৈ করছিল, সেই ভাবেই হৈচৈ করতে লাগল। ব্যথা বেদনা কিছুই রইল না । অনেক পরে তখন ছোটমামা ক্যান্সারে আক্রান্ত হয়ে হাসপাতালে ছিলেন। গুরুমহারাজ কোলকাতায় অবস্থান কালে একদিন মামাকে দেখতে গিয়েছিলেন। ছোটমাসী জিগ্যেস করলেন, 'বাবা কী হবে?' গুরুমহারাজ বললেন, 'এ তো শিবের অসাধ্য রোগ।' ছোটমামা পরলোকগত হলেন। কিন্তু এঁদের ভাগ্য সত্যিই ঈর্ষণীয়! মৃত্যুশয্যায় স্বয়ং গুরু নারায়ণ শিয়রে এসে দাঁড়িয়েছিলেন।

এইরকমই কোনো এক রোগীর ক্ষেত্রে শুনেছিলাম। গুরুমহারাজ হাসপাতালে তাঁর কাছে পৌঁছানোর আগেই তাঁর প্রাণ নির্গত হয়েছিল। কিন্তু গুরুমহারাজ তাঁর শরীর স্পর্শ করার পর কিছুক্ষণের জন্যে প্রাণ স্পন্দন ফিরে এসেছিল। এ কথা শুনে সেদিন বিস্মিত হয়েছিলাম। কিন্তু আজ আর হই না। আজ বুঝি মহাযোগীদের অসাধ্য কিছুই নেই।

(ক্রমশঃ)

আমি কে?

শ্রীরণজিৎ কুমার মুখোপাধ্যায়

মানুষ নিজেকে জানার জন্য নিজেই প্রশ্ন করে এসেছে আমি কে? শিশুকালে মাতৃগর্ভ থেকে ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর বা বাল্যকালে আমি কে এই জানার ব্যাকুলতা আসে না, এমনকি যৌবনকালে কামিনী কাঞ্চন মায়ার বশবর্তী হয়েও না। যখন মানুষ বার্ধক্যে উপনীত হয়, সংসারে মায়ার বন্ধন সম্যকরূপে না কাটলেও কিছুটা কেটেছে এইরূপ অবস্থায় আসে আধ্যাত্মিক চেতনা। তখন উপলব্ধ হয় এই আমি কে? তৎ পূর্বে যাদের দেহ, মন আধ্যাত্মিক চেতনায় উদ্বুদ্ধ তাদের মধ্যেও উপলব্ধ হয় আমি কে ? অর্থাৎ আমি কে জানার জন্য ব্যাকুলতা। আমি কে এর অর্থ আত্মজ্ঞান। আবার যারা সাধক,ব্রহ্মবিৎ, যারা আত্মজ্ঞপুরুষ তাদের মধ্যে জীবন জিজ্ঞাসা বোধ কাজ করে এবং মনের মধ্যে প্রশ্ন উদয় হয় আমাকে জানার। তারা জানেন আত্মা ও মায়া অভিন্ন পদার্থ মাত্র। আত্মা মানে কোন জীবের সেই অংশ যা শরীর নয় এবং যা দেহ জীবিত থাকাকালীন এর ভেতরে থাকে। একে সাধারণত অদৃশ্য এবং শাশ্বত সত্তা হিসাবে বিবেচনা করা হয়। মায়া হল ভারতীয় দর্শনে বিশেষ করে বেদান্ত দর্শনে ব্রহ্মের শক্তি বা ক্ষমতা যা জগৎকে সৃষ্টি করে। এর শক্তি অসাধারণ। মায়া হল সৃষ্টির শক্তি যার দ্বারা সীমাবদ্ধতা এবং বিভাজন একত্রে বিদ্যমান বলে মনে হয় যা সত্য বাস্তব। মহাজাগতিক বিভ্রম প্রতারণা কৌতুক অনেকটা যাদুবিদ্যার মতো। এই মায়া হল সেই শক্তি বা পদার্থ যা আমাদের আসল প্রকৃতি ও জগতের প্রকৃত প্রকৃতিকে ঢেকে রাখে, যা এক প্রকার বিভ্রম বা অজ্ঞানতা সৃষ্টি করে। সে যাই হোক পরমাত্মা ও মহামায়া, অভিন্ন। যতক্ষণ সাধনা আছে যতক্ষণ এই দেহ আছে ততক্ষণ আত্মা মায়া রূপেই অভিব্যক্ত। যখন পরমাত্মা তখন সাধ্য নাই,সাধনা নাই,সাধক নাই,চিন্তা নাই, ভাষা নাই। ভাষা চিন্তা কিংবা সাধনার মধ্যে এলে আত্মা মায়া রূপে প্রকটিত হয়ে থাকে।

আমি কে? ইহা যথার্থ রূপে জানার নাম আত্মজ্ঞান। জাতি ধর্ম বর্ণ সম্প্রদায় নির্বিশেষে নিজের স্বরূপটি জানার জন্য সকলেই লালায়িত। যতদিন সে এটা বুঝতে না পারে ততদিন সে জীব মাত্র। জীব যখন সেটা অনুসন্ধান করে তখন সে হয় সাধক বা ভক্ত। সাধক যখন কর্ম সাধনার মাধ্যমে নিজেকে চেনা ঈশ্বরকে পাওয়া বা আত্মসাক্ষাৎ করে বা তার অভীষ্ট লাভে সিদ্ধিলাভ করে তখন সে উপলব্ধি করতে পারে আমি কে। তখন সে ইহজগতের সমস্ত জাগতিক বস্তুর মধ্যে আমিকে অর্থাৎ নিজেকে দেখতে পায়। সাধকের উচিত ভগবৎস্বরূপ জেনে নেওয়া নইলে সাধনার পথে অগ্রসর হলে সাধনার পথে প্রচুর বাধা বিঘ্নের সম্মুখে তাকে পড়তে হয়। পরিশেষে আমি কে আত্মজ্ঞান লাভ করতে হলে সাধক যে দেব বা দেবীর উপাসক তার শরণাপন্ন হয়। অতি সংক্ষেপে বলা যায় যে সৎ চিৎ ও আনন্দ স্বরূপ আত্মাই হল আমি। আমি দেহ প্রাণ মন কিছুই নয় আমি হাসি কান্না দুঃখ সুখ কিছুই নয় অথচ সেখানে আছে পার্থিব

সুখ ও আনন্দ। অর্থাৎ এক কথায় দেহ, মন, প্রাণ, ইন্দ্রিয়, ধর্ম-অধর্ম, সুখ-দুঃখ জীব জগৎ ইত্যাদি কোন ভাবই না। ওই যে সর্বভাব বিনির্মুক্ত সচিদানন্দ স্বরূপ আত্মা উনিই আমি। উনিই সত্য ও নিত্য। আমিই হলো সাধকের আরাধ্য দেব বা দেবী।

যথার্থ আত্ম স্বরূপ জ্ঞান ঈশ্বরের কৃপা ব্যতীত হবার উপায় নেই, তবে আমাদের ক্ষুদ্র বুদ্ধি দ্বারা যতটুকু ধারণা করা যেতে পারে ততটুকু বুঝতে পাওয়ার চেষ্টা করলে কোন ক্ষতি নেই। এখন আলোচনায় বুঝতে পারা গেল দেহ থেকে একটি পৃথক সত্তা হল এই আমি। আমি কে তা উপলব্ধি করতে পারছি। কিন্তু তাকে ভাষায় প্রকাশ করতে পারছি না। শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তিরা বলেন এই আত্মা বা আমি স্বরূপ হল আনন্দ। আনন্দ বস্তু থেকে বিশ্লেষণ করলে আমরা দেখতে পাই সত্য জ্ঞান এবং আনন্দ অর্থাৎ সৎ চিৎ আনন্দ। সৎ একটি সত্তা একটা কিছু আছে। চিৎ ওই সত্তাটি চৈতন্যময়, সেই যে আছে বলে প্রকট প্রতীতি হয়। উহার শুধু সত্তা নয় চিন্ময় অর্থাৎ জ্ঞানময় এবং ওই জ্ঞানময় সত্তা হল নিরবিচ্ছিন্ন আনন্দময়। আর একটু সরল ভাবে বললে বলা যায় যে আমি আছে আমি বুঝতে পারছি যে আমি আছে এবং ওই আমি কি আমার সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম বস্তু; সুতরাং আনন্দময়। এই সচ্চিদানন্দস্বরূপই তাই আত্মা বা আমি। এই আমি সত্য। এই সত্য লাভ করা জীবের একমাত্র উদ্দেশ্য বিশেষ করে মানুষের। কারণ ওখানে ওই আমিতে জন্ম, মৃত্যু, দুঃখ, সুখ, হাসি, কান্না কিছুই নাই আছে একমাত্র পরিপূর্ণ আনন্দ। পার্থিব সুখ এবং এই আনন্দ কিন্তু এক জিনিস নয়। এ জগতে অভীষ্ট বস্তু পেলে আমার সুখ হয় আনন্দ হয় আর না পেলে দুঃখ হয়। আমি কিন্তু এমনই একটি ক্ষেত্র যেখানে অভীষ্ট অনভীষ্ট পাওয়া বা না পাওয়া কিছুই নাই। আছে একমাত্র আনন্দ। শ্রীশ্রী চণ্ডীতে বলা হয়েছে "অহং রুদ্রেভির্বসুভিশ্চরামি, আমি একাদশ রুদ্র এবং অষ্টবসুরূপে প্রকাশমান।"

"একাদশ রুদ্র—হৃদয় অতি সর্বমন্ত কালে ইতি রুদ্র বেদের ভাষ্যকার সায়নাচার্য বলেছেন, আমিতো কালে যিনি সকলকে কাঁদিয়ে থাকেন, তিনি রুদ্র। চক্ষু কর্ণাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় বাক, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ— এই পঞ্চ কর্মেন্দ্রিয় এবং মন, এই একাদশ রুদ্র। ইহারাই জীবের জন্ম মৃত্যুর কারণ। সুতরাং কাঁদাবারও কর্তা। আমরা সদা সর্বদা ঐ খণ্ড খণ্ড চৈতন্য সত্তার উপলব্ধি করছি। উহাই সত্যিই আনন্দ স্বরূপ আমি— আত্মা, অন্য কেহ নয়। আমি ঐ সকল ইন্দ্রিয় পথে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জ্ঞান রূপে প্রকাশিত। আমি অষ্টবিধ ঐশ্বর্য, আমি দ্বাদশ আদিত্য রূপে বিশ্বদেব বৃন্দরূপে প্রকাশমান। মন বুদ্ধি চিত্ত অহংকার ও সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণরূপে আমি— সত্য স্বরূপ আত্মাই প্রকাশমান। মনকে একবার রুদ্র একবার আদিত্য বলার কোন দোষ নাই। এই মহাবিশ্বে যা কিছু পরিদৃশ্যমান এবং সত্য তাই আমি-র প্রকাশ। এ জগত প্রপঞ্চই।" অহং মিত্রাবরুণৈ--- মিত্র সূর্যের আরেক নাম। দ্বাদশাদিত্যের মধ্যে সূর্যই প্রধান। অন্তঃকরণের সত্ত্ব গুণাত্মক প্রকাশের নাম মিত্র। এক কথায় ধর্মই মিত্র। ধর্মই যথার্থ বন্ধু। কারণ মৃত্যুর পর ও ধর্ম সঙ্গে গমন করে এবং আনন্দ প্রদান করে। বরুণ জলাধিপতি। জীবকে অনন্তকালের জন্য সংসার সমুদ্রে নিমগ্ন করে বলে সে অধর্ম। এইরূপে সমস্ত বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় কোন দেব বা দেবতার মূর্তি সেখানে নেই আছে সচ্চিদানন্দ স্বরূপ আত্মা আমি। আমি নানারূপে এ জগতে প্রকাশিত বা আত্মপ্রকাশ করে আছি। তাই চৈতন্যস্বরূপ আত্মা আমিই যাবতীয় কর্মরূপে কর্মসংস্কাররূপে এবং কর্মফল রূপে বিরাজ করি। আমি এই ব্রহ্মাণ্ডের অধীশ্বর। আমি ব্রহ্ম সাক্ষাৎকার রূপা সম্বিদ। আমি ভুরিভাবে অনন্ত জীবে

প্রবিষ্টা, দেবতাগণ এইরূপে আমাকে বহুভাবে উপাসনা করে থাকে। আমি স্বয়ং নানা তত্ত্বের উপদেশ দিয়ে থাকি। আমি যাকে ইচ্ছা করি তাকে সর্বাপেক্ষা উন্নত পদ প্রদান করি, তাকে ব্রহ্মা করি, তাকে ঋষি করি এবং সর্বপ্রকার মেধা দান করে থাকি।। আমি ছাড়া আমার তত্ত্ব আর কে বলতে পারে। তাই তিনি বলেছেন, "অহমেব স্বয়মিদং" বদামি। ব্রহ্মা বিষ্ণু-মহেশ্বর প্রমুখ দেবতাবৃন্দ দীর্ঘ অনন্তকাল ধরে তপস্যা করছেন সেটা ওই আমার জন্য, আমাকে পাবার জন্য। আর মানুষ সে তো করবেই। দেবতাগণ ও মনুষ্যগণ জ্ঞানে বা অজ্ঞানে আমারি সেবা করছে। আমি একজন— একোহহং। এক আমি সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ আত্মায় বিরাজিত। আমারই ইচ্ছায় সর্বকার্য সংঘটিত হয়। আমি সকল জায়গায় বর্তমান। আমার কার্য্য জীব রূপে, রুদ্র রূপে, জগৎ রূপে, বন্ধনরূপে 'আমি'। আমি অখণ্ড সত্তা, যোগ সাধনার উপায় আমি, বন্ধন 'আমি', বন্ধন ছিন্ন করার উপায় 'আমি'- আবার মুক্তি ও সেই 'আমি'। আমি বহুরূপে প্রকাশমান। আমি জগত পিতাকে প্রসব করে থাকি। আমি সমগ্র ভুবনে অনুপ্রবিষ্ট হয়ে অবস্থান করি। বলতে গেলে আমি জগৎ পিতার জননী স্বরূপ। সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডই আমার।

প্রবন্ধটি আর বেশি দীর্ঘায়িত করবো না। শ্রী শ্রী চণ্ডীর একটি শ্লোক দিয়েই শেষ করছি। শ্লোকটি হল,

"অহমেব বাত ইব প্রবাম্যারভমাণা ভুবনানি বিশ্বা। পর দিবা পর এনা পৃথিব্যৈতাবতী মহিনা সম্বভূব।।" অর্থাৎ আমি যখন বায়ুর ন্যায় প্রবাহিত হই তখনই এই সমগ্র ভুবনের সৃষ্টি আরম্ভ হয়। এই স্বর্গ এই মর্ত্যের পরেও আমি বর্তমান। ইহাই আমার মহিমা।

জয়গুরু

অমৃতবাণী

ভক্ত না থাকলে ভগবান যে নিজেকে জাহির করতেই পারতেন না। ভগবান যে আছেন, তিনি যে অসীম প্রেমময়, করুণাময়, মাধুর্য্যময়— এ কথার জগতে প্রকাশ হতো কেমন করে, যদি ভক্ত না থাকতো? আর গুরু যে সেই শ্রীভগবানেরই মূর্ত্ত প্রতীক রূপে শিষ্যের কাছে আত্ম উন্মোচন করেছেন। শিষ্যের হৃদয়ই তাঁর লীলাক্ষেত্র।

MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC & WELFARE SOCIETY
Rangamati path, Bidhannagar, Durgapur-713212, West Bengal
(A DEDICATED CANCER HOSPITAL)

A LIST OF DONORS (FOR THE PERIOD 17/02/2025 to 20/05/2025)

DATE	RT. NO.	NAME	AMOUNT (RS.)
17-02-2025		Arijit Ghose	750.00
18-02-2025	1740	Durgapur Steel City Society For Education, Durgapur.	3,00,000.00
19-02-2025	1741	Arijit Ghose,Kolkata.	4,500.00
19-02-2025	1742	Swapan Roy Kolkata.	1,00,000.00
21-02-2025	945	A Well Wisher	930.00
01-03-2025		PJ Chandra Finance, Kolkata.	2,000.00
02-03-2025		Bhaskar Bhattacharya, Kolkata.	500.00
25-03-2025		Sayantan Chatterjee, Kolkata.	10,000.00
29-03-2025	946	A Well Wisher.	1,100.00
30-03-2025		Bhaskar Bhattacharya, Kolkata.	500.00
01-04-2025		PJ Chandra Finance, Kolkata.	2,000.00
01-04-2025		Arijit Ghose	750.00
02.04.2025	1714	A Well Wisher.	2001.00
09.04.2025	1715	Jharna Sen	1030.00
14.04.2025	1716	Ashis Sengupta	500.000
19.05.2025	1717	A Well Wisher.	1002.00
07-04-2025		Soma Mitra	1,000.00
10-04-2025		Disciple of Gurumaharaj	2,000.00
16-04-2025		Arun Kumar Chatterjee	3,000.00
18-04-2025		AG Pramanik	170.00
25-04-2025		A Well Wisher	810.00
01-05-2025		PJ Chandra Finance, Kolkata.	2,000.00
03-05-2025		Soma Mitra	1,000.00
12-05-2025	948	A Well Wisher	100.00
20-05-2025	949	A Well Wisher	1,020.00

PLEASE SEND YOUR DONATION:-

For Donation in Indian Rupees:

Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY**. Name of the Bank : **STATE BANK OF INDIA, MUCHIPARA BRANCH, DURGAPUR-713212, BURDWAN, WEST BENGAL.**
ACCOUNT NO. 35626526750, BRANCH CODE: 6888, IFS CODE:SBIN0006888.

For Donation in Foreign Currency:

Name of the Bank Account: **MOHONANANDA CANCER DIAGNOSTIC AND WELFARE SOCIETY.** Name of the Bank **STATE BANK OF INDIA, 11, SANSAD MARG, NEW DELHI-110001, BRANCH CODE: 00691 ACCOUNT NO. 40283076692**
SWIFT CODE: SBININBB104, IFS CODE: SBIN0000691, Account Type: FCRA **(Savings).**

'সত্যের তুমি মূর্ত প্রতীক'

শ্রীগুরুচরণাশ্রিতা কণিকা পাল

গুরুদেবের কাছে শক্তিমন্ত্রে দীক্ষা নেওয়ার পর আমার ছেলে দীক্ষার বই হাতে পেয়ে দেখল যে তাতে গুরুমন্ত্রে দীক্ষারও নিয়মাবলী আছে। সে তখন অনেকই ছোট কিন্তু সেটা দেখে আমার উপর খুবই রাগান্বিত ভাব আমি কেন ওকে আগে একথা জানাইনি তাহলে ও শ্রীগুরুমন্ত্রেই দীক্ষা নিত— "গুরুরূপ ধ্যান করো, গুরু বলো বদনে, গুরুনাম সার করো শান্তি পাবে জীবনে...." যাইহোক এই কথার উত্তরে গুরুদেব বললেন, "গুরু-ইষ্ট একই; আগে গুরুকে ধ্যান জপ করে তারপরেই ইষ্ট নাম জপতে হয়।" এরপরে আর কোনও কথাইতো হয় না। যাদেরই গুরুকরণ হয়েছে, তাদের সবার জন্যই এই বাক্য বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

আমাদের গুরুদেবের তাঁর সন্তানদিগের শিক্ষা দেওয়ার মাধ্যমই ছিল তাঁর কীর্তন। কখনও কখনও এমনই হতো যে অনেকেই নিজ নিজ নানা প্রশ্ন মনে নিয়ে শ্রীগুরুর কাছে এসেছেন, গুরুদেব তখন এমনই কীর্তন ধরেছেন যে প্রত্যেকেই সেই একই গানের ভিতর থেকে নিজেদের সমস্যার সমাধান সূত্র পেয়ে গেছেন।

'অমৃত লহরী' বলে গুরুদেবের যে গানের বইটি আছে, গান নাজানা ব্যক্তিও যদি শুধু বইটিই পড়ে তাহলে আজও তারা তাদের সব জিজ্ঞাসার উত্তর খুঁজে পাবে।

বহু ক্ষেত্রেই আমরা মাঝে মাঝে নিজেদের আচরণে, সত্য মিথ্যার দ্বন্দ্বে বিচলিত হয়ে পড়ি, সেই সময়ে নিজেদের বুদ্ধি বৃত্তির উপর ভরসা না করে সম্পূর্ণরূপে নিজেকে যদি ভগবৎচরণে সমর্পন করতে পারি, তাহলে নির্দেশ তিনি পাঠাবেনই পাঠাবেন। সত্য-মিথ্যার প্রকৃত নির্ণয়— এ বড় কঠিন কাজ, "কবয়োহপ্যত্র মোহিতাঃ"।

যাঁরা নিজেদেরকে সম্যক্‌রূপে শ্রীগুরুপদে সমর্পিত করতে পেরেছেন তাঁদের কাছে ধর্মা-ধর্ম, সত্য-মিথ্যা এগুলির বিচার নেই। তাঁরা যা বলেন তাই-ই ধর্ম হয়, তাঁরা যা করেন তাই-ই সত্য পথ। তাঁরা সত্যকথা বলেন, নিজেদের গুরু-ইষ্টানুপ্রাণিত স্বভাবের মধ্যে। স্বয়ং রামকৃষ্ণদেব বলেছেন, যদি কেউ বারো বছর সত্যকথা বলে, তাহলে সে 'বাক্‌সিদ্ধ' হয় আর বিবেকানন্দের মতে, 'সত্যের জন্য সবকিছুই ত্যাগ করা চলে কিন্তু কোনও কিছুর জন্যই সত্যকে ত্যাগ করা চলে না।' আমাদের শ্রীগুরুদেব বলেছেন মন-মুখ এক করে কাজ করতে।

গুরুদেবের কথা হল নামে ডুবে যাও, তাঁর নামের গুণে নির্দোষ প্রজ্ঞার আবির্ভাব হয়। অবিরাম তাঁর নাম করো, হরর্ণামৈব নামৈব নামৈব কেবলম্।

তিনি গেয়েছেন, "হরি নামের গুণে তরিতে পারিবে তুফানে হরি প্রেমের গুণে তরিতে পারিবে তুফানে— হরি বোল, হরি বোল, বলো শয়নে স্বপনে জাগরণে।" আবার বলেছেন, "শ্বাসে শ্বাসে জপ

নাম হরে রাম হরে রাম, দিওনা দিওনা বিরাম হরে রাম, হরে রাম; হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে, হরে রাম, হরে রাম, রাম রাম হরে হরে।"

সেইজন্য নামের অভ্যাস আমাদের যদি করা থাকে তাহলে মরণকালেও নামের ওঙ্কার স্থিতি অন্তরে অনুভূত হয়।

ভাগবতে আছে এক কুখ্যাত ব্যক্তির মৃত্যুকাল উপস্থিত হলে যমরাজের দূত এসে তাঁর সম্মুখে দাঁড়ান তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য; তিনি তখন ভয় পেয়ে 'নারায়ণ, নারায়ণ'— বলে চীৎকার করতে থাকেন। এবার নারায়ণকে ডাকার জন্য তিনি তাঁর দূতকে পাঠান। এদিকে দুই তরফে ঝগড়া বেধে যায়। আসলে যমদূতকে দেখে ইনি ভয় পেয়ে নিজের ছেলেকে (যার নাম নারায়ণ)। তাকে ডাকেন; তখন স্বয়ং নারায়ণের (ভগবানের) আদেশ হয়, "যাকে মনে করেই ডাকুক না কেন সেতো আমার নামই করছে," এতেই তার মুক্তি হল। লক্ষ্য করে দেখবেন আগেকার দিনের মানুষেরা বাড়ির সদ্যোজাত শিশুদের নামকরণ করতেন এইভাবে, যাতে তাদের ডাকার মধ্য দিয়ে নিজেরা ঐ ভগবানেরই নাম করেন। যেমন নর নারায়ণ, লক্ষ্মীপদ, হরিহর, সাবিত্রী, গীতা, লক্ষ্মী, গৌরী, দুর্গা, পার্বতী ইত্যাদি। এখন অবশ্য যুগের অনেক পরিবর্তন হয়েছে।

অতএব প্রাণরূপী শ্বাসকে নামে বলি দিতে পারলে সর্ব-ইন্দ্রিয়গুলি বশে আসতে বাধ্য হবে। তবে সে বড় কঠিন কাজ। দীক্ষা নেওয়ার পরে পরে গুরুমহারাজজীর কীর্তন শুনতে যেতাম। সেই সময় উনি জ্ঞাতই থাকতেন। বেশিরভাগ বাড়িতে তিনদিন করে অবস্থান করতেন পরবর্তীকালে অবশ্য সেটা একদিন হয়ে গিয়েছিল ওনার সময়ের অভাবে। সেই কীর্তনের আসরে বিভিন্ন সময়ে সঙ্গত করতেন অজিতদা, ভীষ্মদা, দীপেনদা, দীপ্তিদি, বাণীদি আরও অনেকেই। জমজমাট সে আসর, আমরাও সকলে দোহার দিতে দিতে সুরগুলি শিখে গিয়েছিলাম, গুরুমহারাজজীর অপ্রকটকালে গোকুলজীও কয়েক বছর তাঁর সুরেলা কণ্ঠে এই কীর্তনে সবাইকে কিছুটা হলেও সঙ্ঘবদ্ধ করে রেখেছিলেন। আমার মনটা কেন জানিনা ঐ নামের আশ্রয়ে ডুবে গেল, আহা 'দয়াল একি নাম এনেছ....., নামের প্লাবনে ডুবিল ভারত অবণী যাইল ভাসিয়া....."। আমরা যেহেতু গুরুমহারাজজীর সন্তান সেই সুবাদে বিভিন্ন আশ্রমের যেমন, মা আনন্দময়ী, ওঁকারনাথজী, শিবানন্দগিরি, রামঠাকুর এমনকী রামকৃষ্ণ মিশনের সাধক-সাধিকারা কোনও সময়ে মুখ ঘুরিয়ে নেননি বরঞ্চ উৎসাহ ভরে এসে তারকব্রহ্মনাম, অথবা চণ্ডীপাঠ করে যান মাঝে মধ্যেই।

মার্চমাসের দ্বিতীয় সপ্তাহেই 'কৈলাস' থেকে কীর্তনীয়ার দল এই 'কঙ্কন চুনচুন' গৃহে নাম পরিবেশন করেন। খুব ছোট্ট আলোয় প্রায় বলা যায় একরকম অন্ধকারেই মাইকে নাম হচ্ছে গৃহে যাঁরা আছেন-বাকী সাড়া পাড়ায় নামের ধ্বনি রণিত হচ্ছে। আমার স্বামী কিছুদিন ধরেই নিজেকে প্রায় সংসারের সবকিছুর থেকেই গুটিয়ে নিয়েছিলেন। শরীরটা জরাজীর্ণ হয়ে গিয়েছিল কিন্তু শুয়ে শুয়ে সমানে নামের সাথে সাথে জপ করছিলেন।

এর মাত্র অল্প কদিন পরেই উনি রাতের খাবার ঔষধ সেবন করেন, তারপর ঘুমের প্রস্তুতি। হঠাৎ করে চোখটা কপালে উঠে যাওয়ায় আমি তাড়াতাড়ি করে তুলে ধরে কানের কাছে জোরে জোরে বলতে থাকি বলো: 'জয়গুরু,' 'জয়গুরু'; বুঝতে পারছিলাম চলে যাচ্ছে, সে আমার 'জয়গুরু' চীৎকারে স্বাভাবিক ভাবেই আধচক্ষু তাকালো, চোখের নীচে একটু জল— চোখ বুজে গেল।

আমার সেই গানটা মনে পড়ল— "অর্ধ্ব অঙ্গ গঙ্গাজলে, অর্ধ্বঅঙ্গ থাকবে স্থলে, কেউ বা বলবে হরে হরে...." আমি মহারাজজীর বিভূতি এনে লাগিয়ে দিলাম। কী জানি সেই মুহূর্তকে ও কীভাবে গ্রহণ করেছিল?

কার কখন শেষ নিঃশ্বাস পড়বে কিছুই ঠিক নেই; তাই নামরসে সর্বদাই ডুবে থাকার অভ্যাস সকলেরই থাকা উচিত। তবে গুরুকৃপা ভিন্ন নামে ডুবে যাওয়াও এত সহজ পন্থা নয়। তারজন্য গুরুকেই মনপ্রাণ দিয়ে আঁকড়ে থাকা দরকার। একমাত্র তাঁর পক্ষেই সম্ভব সহস্র সহস্র নদী, জলধারাকে সাগরের সাথে মিলিয়ে দেওয়া।

এই সাগর বলতে জনৈক স্বামীজির একটি গানের ব্যাখ্যা মনে পড়ে যাচ্ছে। নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশনের প্রার্থনা সঙ্গীতের অন্যতম ছিল এই গানটি— "মেঘ বলেছে যাব যাব, রাত বলেছে যাই...." উনি বলছেন ছাত্ররা কতটা তার মানে বুঝতে পারছে, তা বলা মুশকিল, তবে ওনার ব্যাখ্যাটি আমি যথাসাধ্য তুলে ধরার চেষ্টা করছি। আশা করছি সবার ভালো লাগবে।

মেঘ বলেছে যাব যাব রাত বলেছে যাই— সারারাত ধরে মেঘ বর্ষণ করেছে। আমরা ভালোবাসার জিনিস পাবার জন্য কত কঠিন পরিশ্রম করি, সবাইকে পরীক্ষা দিতে হয়— মেঘ বলছে সারারাত ধরে পরিশ্রম করলাম এবার আমি যাই; রাত তখন বলছে তুমিও যাবে, আমিও যাব। সাগর বলছে আমিও রণেভঙ্গ দেব।

এত দুঃখ পেলাম। দুঃখ বলে "রইনু চুপে তাঁহার পায়ের চিহ্ন রূপে"— এই সবার চলে যাওয়ার পর উজ্জ্বল আলোক ঝলমল আকাশ চক্ষু মেলল, অন্ধকার কেটে গেল— গুরুমহারাজ যেমন গাইতেন "যব চারো তরফ আঁধিয়ারা হো, আশাকা দিন কিনারা হো" —অর্থাৎ কিনা যখন সমস্তটা অন্ধকারে আচ্ছন্ন হয়ে যাবে তখনই আশার আলো উঁকি মেরে দেখা দেবে— সে যাই হোক, একুল থেকে সাগর ওকূলে মিলিয়ে দেওয়ার পরে সেখানে আর এক পরিবেশের সৃষ্টি হয়ে আছে।

দেখা যাক এবার ভুবন কী বলছে, আমাদের সবচেয়ে বড় শত্রু হল মৃত্যু; ভুবনের একটা অংশ, সব সময় সেই মরণকে চিন্তা করে এসেছি, কিন্তু বুদ্ধ তার তপস্যার চিহ্নরূপে এসেছে। ভুবনের আর একটা অংশ সবাই— সেই ভুবন বলছে "তোমার লাগি আছে বরণমালা, গগন বলে তোমার তরে লক্ষ প্রদীপ জ্বালা," অর্থাৎ কিনা এবার প্রেম বলছে যুগে যুগে তোমাদের জন্য সেই গগনেরই লক্ষ তারারা প্রদীপ জ্বালিয়ে অপেক্ষা করে আছে বরণ করে নেবার জন্য। সেই মরণকে আবার জীবনতরী তোমার কাছে দেবে— তুমি মৃত্যুঞ্জয়, তুমি দায়িত্ব নিলে তাকে রক্ষা করার। মৃত্যুঞ্জয় হলেন শিব— তিনি এসে কোলে তুলে নেবেন, এই জীবন আমাদের আর কোনও কাজে লাগবেনা— কে বলে যে সেই প্রভাতে নেই আমি; এমনই লীলা তব; আবার বলছেন দেখব আমি তাকিয়ে এই জীবনের উদ্দেশ্য। আমাদের এই গন্তব্যস্থলে পৌঁছে দেন কে? শ্রীগুরু–

"সবার নীচে ধূলার পরে ফেলো যারে মৃত্যু শরে
সে যে তোমার কোলের পড়ে,
ভয় কি বা তার পড়নকে?"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদকীয়

"গুরু নাম সার করো"

প্রত্যেক বছর গুরুপূর্ণিমা তিথিতে ব্যাসদেবের কথা আমরা উল্লেখ করে থাকি। আসলে তিনিই সর্বপ্রথম গুরু রূপে পূজিত হয়েছিলেন। এইজন্য গুরুপূর্ণিমা তিথিতে প্রথমে ব্যাসদেবের পুজো করা হয়, তারপর হয় আপন আপন দীক্ষাগুরুর পুজো।

গুরু অর্থে যে কেবল দীক্ষাগুরু তাই-ই নয়, যিনিই আমাদের কিছু শিখিয়েছেন তিনি হলেন শিক্ষাগুরু, এর মধ্যে প্রকৃতি ও অন্তর্ভুক্ত সেখান থেকেও আমাদের অনেক কিছুই শেখার আছে— ঐ যে কবিতাটিতে পাই; আকাশ আমায় শিক্ষা দিল উদার হতে ভাইরে..., পাহাড় শিখায় তাহার সমান হই যেন ভাই মৌন মহান"... কাজেই শিক্ষার কোনও বয়সও নেই আর শেষও নেই।

তবে আধ্যাত্মিকতা নিয়ে যখন আমরা আলোচনা করছি তখন সেটা দীক্ষাগুরুকেই স্মরণ করিয়ে দেয়। আমাদের জীবনের চরম লক্ষ্যই হল ভগবান, আর যুগে যুগে এই ভগবানই মনুষ্যদেহ ধারণ করে "পাপী তাপী তারণ তরে" এই ধরাধামে আবির্ভূত হয়েছেন।

সমস্ত প্রয়োজনীয় বিষয়গুলিকে ঋষিগণ সত্তা চৈতন্য ও আনন্দের অন্তর্ভূত দেখেই সচ্চিদানন্দময় বলে সম্বোধন করেছেন। যাতে আমাদের ভেতর দিয়ে তাঁর সত্তা, তাঁর চৈতন্য, তাঁর আনন্দ অনন্তজ্ঞান পরিস্ফুট হতে পারে। পুজোর দ্বারা আমরা এইসকল অনন্ত আনন্দের অধিকারী হতে পারি, আমাদের দেহাদি যেন তাঁর প্রকাশের যন্ত্ররূপে পরিণত হয়।

ভগবৎ প্রাপ্তি বিষয়ে ভগবৎ কৃপাই অর্থাৎ আমাদের গুরুরূপী ভগবানের কৃপাই সর্বপ্রধান এই কথা স্মরণে রেখে এই গুরুপূর্ণিমা তিথিতে আমরা যেন যথার্থরূপে তাঁর পুজো করতে পারি, তাঁকে অনুভব করতে পারি, তাঁকে সেবার দ্বারা তুষ্ট করতে পারি— কিন্তু সেইসবও তাঁরই কৃপা ছাড়া সম্ভব নয়। "আমি যন্ত্র, তুমি যন্ত্রী, যেমন চালাও তেমনি চলি..." তাই আমাদের পরম প্রার্থনা হে গুরুদেব-আমাদের তুমি তোমার মনের মত করে গড়ে নাও, আমরা যেন তোমার কাজে জীবন মন সমর্পন করে ধন্য হতে পারি। আমাদের জীবনে তোমার ইচ্ছা যেন পূর্ণতা লাভ করে। আমার বলিয়া কিছু নাই হরি, সকলই তো তোমারই দান..."।

তোমার শ্রীচরণে আমাদের শত সহস্রকোটি প্রণাম জানাই গুরুপূর্ণিমার এই শুভলগ্নে।

জয়গুরু